সহজিয়া

B.SC MLT

Belur Sramajibi Swasthya Prakalpa Samity

অন্তরা মণ্ডল

BMLT, 2ND YEAR

সহাভিয়া

শারদ সংখ্যা ২০২৩

সম্পাদক

শামীমুল হক

প্রচ্ছদ ও বিন্যাস

তানবীর আহমেদ

অলংকরণ

CANVAS

প্রকাশক

B.SC MLT STUDENTS, BSSPS

ঠিকানা

104A Dewangazi Road, Bally, Howrah, 711201

সম্পাদকীয়

প্রিয় বন্ধুরা

পত্রিকা মূলত লেখক ও পাঠকদের মিলনমেলা। এখানে শিক্ষণীয়, আকর্ষণীয়, উদ্দীপনামূলক , প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকে। যা পূরণে আমাদের প্রতিষ্ঠান 'বেলুড় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প সমিতি ' বদ্ধ পরিকর। এই প্রতিষ্ঠানের বি.এম.এল.টি. বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়াসে প্রথমবার কোনো ডিজিটাল পত্রিকা 'সহজিয়া' প্রকাশ পেতে চলেছে। প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক সমাজের পাঠকদের চাহিদা পূরণে "সহজিয়া" অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। আমাদের প্রথম সংখ্যাটি সমৃদ্ধ করতে যাদের লেখা, শ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা আছে তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কিন্তু পত্রিকা টির প্রকাশের পিছনে যার সব থেকে বেশি শ্রম আছে তিনি হলেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের সকলের প্রিয় শিক্ষিকা শ্রীমতি ড: শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি ম্যাডাম, ওনার প্রতিমুহূর্তে অনুপ্রেরণামূলক কার্যকলাপের জন্য এই বিষয়ে আমরা আজকে এত দুর এগোতে পেরেছি । ম্যাডামকে আমরা আগামী ভবিষ্যতে ঠিক এইভাবে পাশে পেতে চাই এটাই আবেদন ।

যেকোন ধরণের প্রকাশনাই কষ্টসাধ্য। কারণ এরসাথে বিভিন্ন ধরণের কাজ জড়িত। আমরা 'সহজিয়া' কে নির্ভুল ও তথ্য সমৃদ্ধ করতে যার পর নাই চেষ্টা করেছি, জানিনা কতটুকু পেরেছি। বিচারের দায়ভার আপনাদের। আর যতটুকু ব্যর্থতা রয়েছে তার দায়ভার আমাদের। আমাদের এই শুভ সূচনালগ্ন থেকে চলমান প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি ধাপে আপনাদের সরব উপস্থিতি আমাদের একমাত্র কাম্য।

সকলের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করছি। আপনাদের জীবনের চলার পথ আরো সহজ হয়ে উঠুক এটাই চাওয়া 'সহজিয়া' র পক্ষ থেকে ।

তারিখ: ১৮/১০/২০২৩

সম্পাদক বন্ধু

সূচিপত্র

আত্মকথা
চিত্রাঙ্কন
খোলা চিঠি
কবিতা
অনুকবিতা
ফটোগ্রাফি
নিবন্ধ
গল্প

আমার জন্মভূমি

ডা:তপন কুমার দত্ত
BMLT,BSSPS
(PATHOLOGY FACULTY)

কি মুস্কিলেই পড়েছি।যাদের কোনো অনুরোধ আমি কখনোও উপেক্ষা করিনি, তারা বলছে একটা লেখা দিতে,তাদের পত্রিকার জন্যে।কি লিখব,ভাবতে ভাবতে আমার ছেলেবেলার কিছু কথা, আবছা মনে পড়তে লাগলো।আমার জন্মভূমির কথা।

আমার জন্ম ভারতবর্ষের এক স্বল্প খ্যাত (তখন ছিল) রাজ্য ত্রিপুরায়। অবিভক্ত ভারতে ত্রিপুরা বলতে বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলাকে বোঝাত। বর্তমান ত্রিপুরা কে বলা হত "পার্বত্য ত্রিপুরা"। এই স্বল্প খ্যাত ত্রিপুরার আরও স্বল্প খ্যাত জায়গা কৈলাসহর।সেখানেই কেটেছে আমার ছেলেবেলা, কৈলাসহরের উল্লেখ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "রাজর্ষি"উপন্যাসে। মহারাজ গোবিন্দ মানিক্য বাহাদুর তাঁর ছোট ভাই নক্ষত্র রায়কে "কয়লাসর" নামে পরগনার শাষক নিযুক্ত করেছিলেন।ত্রিপুরা আর তার রাজধানী আগরতলা সারা পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হয় "বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ"র সময়, সমস্ত দেশের সাংবাদিকরা তখন এখানে এসে ডেরা বেঁধেছিল যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করার জন্যে।সেটা ১৯৭১ সাল তার আগে- আমি যখন ১৯৬৮ তে বাঁকুড়া জেলায় কলেজে ভর্তি হলাম আমার সিনিয়ার দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন," তোর বাড়ি কোথায় রে?" "আগরতলায়"।"আগরপাড়া? ওখানে কোন এলাকায় রে?" "আজ্ঞে, আগরপাড়া নয়, আগরতলা, ত্রিপুরা তে"। "সেটা কোথায়, আসামে?" "না"।" ওহ, তাই বল, তুই এস.ডি বর্মন কে চিনিস? আর.ডি. বর্মন কে?" এতক্ষনে তাঁর কিছুটা হলেও মনে পড়ল।ত্রিপুরা সম্বন্ধে এইটুকু ধারণাই তাঁর ছিল।পরে মনে হয়েছে তাঁর দোষ নেই, আমরা ভূগোল বইতে ত্রিপুরা সম্বন্ধে কিছু পড়েছি বলে মনে পড়ে না।অবশ্য ভারতবর্ষের ম্যাপে এর উল্লেখ ছিল।

সেই আগরতলা,সেই ত্রিপুরা আর নেই। কিছুদিন আগে একবার আগরতলা গিয়ে দেখলাম আমার বাড়িতে যাবার রাস্তাটা সহজে চিনতে পারছি না। ত্রিপুরা এখন একটা জনপ্রিয় বেড়াবার জায়গা হয়ে গেছে। এই লেখার পাঠকরাও হয়ত সুযোগ পেলে কোনদিন সেখানে বেড়াতে যেতে পারে।

শ্রীমতি মধুমিতা সেনগুপ্ত

Microbiology & Spoken English Faculty
BMLT-BSSPS

শ্রীমতি সুস্মিতা দত্ত

Microbiology Faculty
BMLT-BSSPS

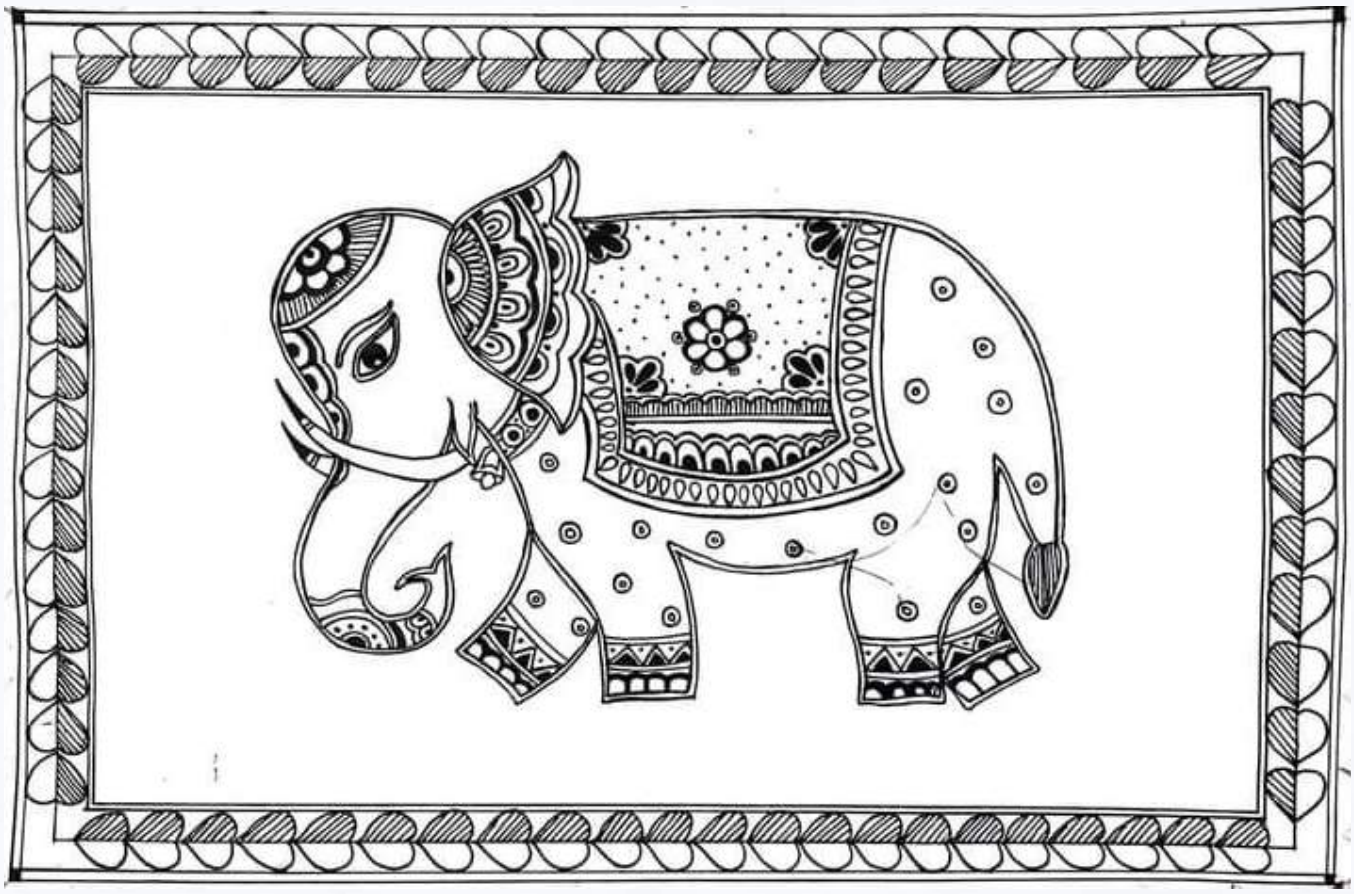

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

BMLT,2NDYEAR

পিয়ালী সরকার

BMLT, INTERN

সৌমদীপ দেবনাথ

BMLT, 2ND YEAR

তিয়াসা মণ্ডল

BMLT, 3RD YEAR

খোলা চিঠি

সুগত দাস
BMLT,INTERN

স্নেহবরাসু তিলোত্তমা,

বাঙালির আবেগের শারদীয়া দুর্গাপুজা ও দুর্গোৎসব শুরু হতে চলেছে তোমার শহরে ,আর কিছুদিনের মধ্যেই। শরৎের শিউলি ফুল আর রেললাইনের ধারে গোজিয়ে ওঠা কাশফুলই হয়তো জানান দেয় আমার আগমন তোমার শহরে, কিন্তু তাও প্রতিবছরের ন্যায় পত্রাঘাত না করলেই নয়।

"আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর; ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা; "

জানো তিলোত্তমা,বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের দৃঢ় কণ্ঠের মহালয়ার শুভ সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় বাঙালির প্রাণপ্রিয় উৎসব, নেমে পরে রাস্তায় রাস্তায় মানুষের জনজোয়ার , একসাথে পুজোর কাজে হাত লাগানো আরও কতকিছু। আজকাল তো কলকাতার পুজো শুরু হয় মহালয়া থেকে ,চলে মন্ডপে মন্ডপে ঘুরে পুজো দেখা। সাবেকিয়ানা আর বনেদিয়ানায় ঘেরা আনন্দগুলোর সাথে মিশে যায় বাঙালির সংস্কৃতি, খাওয়া-দাওয়া।

জানো তিলোত্তমা,আমার আগমন তোমার শহরে একটা তীব্র গন্ধ আর পরিবেশ তৈরি করে ভালোবাসার , বন্ধুত্বের কিংবা ভাতৃত্বের । সেটা হতে পারে শহরের বিভিন্ন কণায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বন্ধুদের পুর্ণমিলনের সুযোগ , সেটা হতে পারে পরিবারের সবথেকে ক্ষুদে সদস্যের সাথে বয়স্ক সদস্যের পাড়ার পুজো মন্ডোপে আনন্দ করা আবার সেটা হতে পারে তোমার শহরের বুকে প্রেমিক-প্রেমিকার একসাথে হাত ধরে প্যান্ডেল হপিং করা। উৎসবের গা-জোয়ারী আনন্দ-উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে যায় সারা শহরের গরিব শ্রেনী থেকে ধনী ব্যক্তিবর্গ , দুঃখি থেকে সুখী সবাই। পুজোর এইদিনগুলো আন্তরিকতার সাথে আনন্দ করার জন্য ফ্রেঞ্চ লেখক Dominique Lapierre তোমার শহরকে THE CITY OF JOY বলে অভিহিত করেন তার লেখায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ , সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তোমার শহর ও শহরতলীতে শারদীয়া দুর্গা পুজো ও পুজোকেন্দ্রিক দুর্গোৎসবে কখনো ছেদন ফেলতে দেয়নি।

জানো তিলোত্তমা, আগের দিনের পুজো ও আজকের দিনের পুজোর প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু পার্থক্য চোখে পড়ছে আমার। এই যেমন ধরো, বড়ো বড়ো বারোয়ারী পুজোগুলো কেমন যেন থিমকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। আবার ধরো আগের দিনের পুজোর আগে কত পুজোর বাংলা গান বের করা হতো , কত ম্যাগাজিন ছাপা হতো। সেসব আজ বিরল হয়ে গেলেও বাঙালি মননে আজও শারদোৎসবকেন্দ্রিক আনন্দ-উল্লাসে কোনো ভাটা পরেনি, সেটা দেখেই ভালো লাগছে।

আশাকরি পুজোর কেনাকাটা নিশ্চই হয়ে গেছে তোমার। বৃষ্টি তোমার শারদোৎসবের আনন্দ-উৎসবে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না,সেই কামনাই জানাই। পরিশেষে জানাই , মা আসছেন সকলের মঙ্গলের জন্য আবার চলেও যাবেন বিজয়ার দিন সবাইকে কাঁদিয়ে ,তাই তোমার ও তোমার পরিবারকে আমি আন্তরিকতার সাথে জানাই ,বছরের অন্য দিনগুলিও আনন্দের সাথে কাটুক।

পুনরাগমনায়চ
তোমার শারদোৎসব

সিনিয়র

তানবীর আহমেদ
BMLT- 2ND YEAR

সিনিয়র - কলেজ জীবনের সঙ্গে জড়িত খুব একটা চেনা শব্দ। কারো কাছে বিভীষিকা তো কারোর কাছে ভালোবাসার আর একটা মাধ্যম। সেরকম আমিও ব্যতিক্রম নয়। আমার কলেজ জীবন শুরু হয় ঠিক ১ বছর আগে। ভর্তির দিনে অফিস রুমে স্যার জোর গলায় বলেছিলেন "ragging is strictly prohibited here, so don't tense" শুনে তো ভালই লেগেছিল। কিন্তু যেইদিন প্রথম হোস্টেল এলাম, খুবই ক্লান্ত দিব্যি ঘুমাচ্ছি, রাত্রি ১২:৪৫ তখন, দরজায় জোরে জোরে ২-৩ বার আওয়াজ পড়লো। দরজা খোলা হলো এই তো তারা এসে গেছে সিনিয়র, মনে excitement থাকলেও একটু ভয় লাগছিল যে কি করবে বাবা এত রাত্রে। সেই দিন কিছু হয়নি পর দিন পাশের রুম এ একে একে সবাইকে ডাকা হলো ওই একটু ইন্ট্রো দেবার জন্যে আরে পাতি বাংলায় যাকে বলে চাটাচাটি একটু আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ। নিজের প্রিয় IPL দলের সাপোর্টার পেয়ে গেছিলাম কি আর চাই। সিনিয়র তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভয়, ভালোবাসা কোনোটাই কম ছিলনা আমার মধ্যে। হয়তো তাদের মধ্যে আমাদের জন্যে সেই একই জিনিস ছিল। ভুল টাকে ভুল, ঠিক টাকে ঠিক বুঝিয়ে দিয়েছে কান মুচড়ে। আবার বিপদে আপদে হাত বাড়িয়েও দিয়েছে যখন বলেছি। ভুল বোঝাবুঝি হয়ছে কয়েকবার কিন্তু তাদের আর আমাদের মধ্যে ভালোবাসার যে LOC মানে লাইন অফ কন্ট্রোল কোনদিন বিঘ্ন হয়নি অন্তত আমার সাথে না। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে পরীক্ষার সময় এর সেই রাতজাগা সময়।বারবার এসে সান্ত্বনা দেওয়া "চাপ নেই guys, বিন্দাস হবে"। জীবনে প্রথমবার আমার বার্থডে সেলিব্রেট হলো হোস্টেলে তখনও তাদের পাশে পেয়েছি, হয়তো খারাপ লেগেছিল পচা ডাল আমার উপর দেওয়া হয়েছিল। বিকেলে ক্রিকেট থেকে শুরু করে রাত্রে চিকেন পার্টি এবং ভোরে তাস কোনো আসরে মজা হয়নি কম। আজ কলেজ জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়েছে এবং একটি দলের শেষ হয়ছে কলেজ জীবন। আজ আমিও সেই "সিনিয়র"। নতুন সেই চেহারা আবারও সেই ভয় তারাও অনুভব করবে। আমরাও একটু দাপট দেখানোর চেষ্টা করবো, আবার আমাদের সিনিয়র রা শিখিয়ে দিয়েছে সেটা পালন করার চেষ্টা করবো।এই জুনিয়র - সিনিয়র সম্পর্ক যেনো চিরকাল প্রতীক হয়ে থাকে ভালোবাসা,সহায়তা,শ্রদ্ধা এর কোনো Ragging নামক বিষ এর না। আমার অজান্তেই কোনো ভুল হয় থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী , আর THANK YOU for your guidance SENIOR !!

পুজোর গন্ধ

সম্রিক* কান্ডার
BMLT,2ND YEAR

পুজোর গন্ধ মানে মা আসছে নিজের বাড়ি -
পার্বতীদের নতুন শাড়ির অপেক্ষা...
কার্তিক,গণেশদের শুরু হয় কেনাকাটার ধুম।
পুজোর গন্ধ মানেই- শরদাবৃত তুলতুলে মেঘ,
অনাবৃত পা আর ঘাস মাখা শিশির;
মাটির সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে মৃদ শিল্পীদের ঘরে ঘরে,
কাশের মোহের প্রচ্ছন্ন স্বপ্নালু আবেগ,
ছড়িয়ে পড়ে দূরে-আরো দূরে...
শিউলিরা অস্তিত্বের জানান দিতে ঝরে পড়ে মাথায়,
কান পাতলেই শোনা যায় ঢাকের আওয়াজ।
পুজোর গন্ধ মিশে যায় বাতাসে...

ছুটি

অরিজিৎ দাস
BMLT,2ND YEAR

আজ যদি মা আসতাম ফিরে,
ছুটি-রা রাত জাগতো আমায় ঘিরে।

আমি বলতাম দুপুর এখন সবে -
নাহয় যেনো সত্যি-ই হলো তবে।

ছুটি বলতো তার নাকি ভীষন খানিক ব্যাথা-
বলতাম আমি-এই যে, এসেছি ফিরে হেথা।

ছুটি বলতো আদর করে কনিও মোর যন্ত্রণা-
বলবো আমি জানি না তো তেমন কোনো মন্ত্রণা।

আমি এখন হোস্টেলে তে থাকি -
ছুটি র সাথে নেই কো কোনো বোঝাপড়া।

ছুটি পড়লে ফিরি যখন বাড়ি -
মায়ের মুখে হাসি খানিক ফুটি.।

দেখতে পাই সে রোজগেরে সব ঘটনা -
পাড়ায় রটে আমায় নিয়ে সব রটনা.।

হোস্টেলে তে হয় নাকো কোনো পড়া -
হয় খালি আড্ডাবাজি আর বোঝাপড়া.।

সান্ত্বনা দিয়ে মা কে আমি বলি -
দেখবে একদিন.! আমি ও সেদিন তোমার সাথেই চলি.।

দুর খানিক বটে আমার কলেজ টা -
বাড়িতো মা আসবোই আবার ফিরে ,
অপেক্ষা শুধু বছর কয়েকটা...

বেলাডুবি

সৈয়দ সার্ফুদ্দিন আহমেদ
BMLT,Intern

সময় যখন দুপুর পৌনে বারোটা

আমি তখন ভাঙা কাঠের চেয়ারে একলা বসে মায়ের ঘরের ওই ব্যালকনিটায়,

মায়ের এই ব্যালকনিটা থেকে না দূরের ওই পাকা রাস্তাটা দিব্যি দেখা যাচ্ছে

আর আমি না একটু মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ফুঁ দিচ্ছি গেঞ্জি খানি একটু টেনে ধরে...

আজকাল সূর্যমামা কেনো যে এত রেগে?

আর জানলা দিয়ে লু বইছে প্রচন্ড বেগে

অনেকটা সময় ধরে এক দৃষ্টি তে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থেকে,

দেখি একটা মাঝবয়সী মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে একেবেকে

একটু খানি চোখ বুলিয়ে

চিনতে পারি, আমার সেই প্রথম জীবনের প্রেম সূর্যমুখিকে, আমার বয়স যখন উনিশ কুড়ি

তখন সে পরতো সরস্বতী পুজোয় লাল পেড়ে সাদা শাড়ি!!!

আর সেই খোঁপায় গাঁথা রজনীগন্ধার মালা আর হাতে থাকতো তার রংবাহারী নকশা করা বালা

গোটা স্কুল তখন মত্ত ছিল তার চেহারা তে

আমিও ছিলাম তার এক বেকার আশিক
কিন্তু আজ সে কেনো সাদা শাড়িতে?

ওটা ভাবছিলাম,

অমনি সময় পাস থেকে মা বলে উঠলো ওই যে গেলো ওটা সেই সূর্যমুখী !!!

আমি বললাম মা সাদা শাড়ি কেনো?

মা বললো তখন স্বরটাকে একটু চেপে ওমা, ও যে বিধবা কলেরায় ওর স্বামী গেছে চলে...

আমি আশ্চর্য, ও বেঁচে আছে তাহলে কোন স্বপ্ন আঁকড়ে ধরে ???
গোটা স্কুল যাকে চিনে ছিল শাড়ির ওই প্রতি টা ভাজের দ্বারা,

আজ সমাজ তাকে চিনিয়ে দিলো...

ওই মেয়ে আজ তুমি সর্ব হারা!!!

শীতের স্মৃতি

শঙ্খ ব্যানার্জী

BMLT,2ND YEAR

শীতের শেষে গর্মিটা জানো -
এবার পড়েছে খুব,
গাছগুলো সব সবুজ পাতায়
এক্কেবারে চুপ।

শীতকাল টাই বেশ তো ছিলো
ফফির চুমুকে , শীতের বেশ
আগুন পোহাতে , সন্ধেবেলা
খোশ মেজাজে আড্ডা বেশ।

ফচি শসা, ধনে পাতা
চাট করে বেশ জমত মুড়ি,
বেগুন পোড়া, পিয়াজ , লঙ্কা
নেইতো তার কোনো জুড়ি।

বেগুন ভাজা, ভেজ ডাল
কিংবা বেগুন ভর্তা রুটি,
আলুর দমের সাথে লুচি
অথবা দিয়ে কড়াই শুঁটি।

পালং, মুলো, বড়ির ঘণ্ট
বাঁধাকপিতে মাছের মুড়ো,
কবজি ডুবিয়ে খাবে সবাই
বাচ্চা ছোক কিংবা বুড়ো।

মোগলাই সব রান্না যত
গুছিয়ে শীতে খেয়েছি কত,
বাটার চিকেন, বাটার টোস্ট
ফুলকপির রেজালা আর রোস্ট।

পালং পনির, আলুর পরোটা
কিংবা কড়াই শুঁটির কচুরি,
ছোলার ডাল, কাবলি ছোলা
সঙ্গে টক চাটনি আচারি।

তার 'পরেতে নানান পিঠে
পৌষ শেষে ভরায় মন,
পিঠের স্বাদ তো পচ্ছু হাতেই
পারবে না তো ,যে সে জন।

ভাজা পিঠে, আসকে পিঠে
পাটিসাপটা, সরুচাকলি
ভজন ভজন সেদ্ধ পিঠে,
গন্ডা কতক দুধপুলি।

শীতেই যত ঘুরতে গেছি -
সিমলা, ডুয়ার্স , কিংবা উটি,
গোয়া , সিকিম সেও তো গেছি
গুলমার্গ বা কন্যাকুমারী।

ঘোরা , বেড়ানো ইচ্ছে মত
খাওয়া, দাওয়া ও জমকালো
সেরা ঋতুর পদক টা তাই,
শীত কালকেই মানায় ভালো।

বিশ্বাস

সবুজ মাইতি

BMLT,2ND YEAR

বিশ্বাস, শব্দটি সত্যিই অদ্ভুত
আমার কাছে যা আবেগ প্রাপ্তির আকাংক্ষা
তোমার কাছে তা অভিনয় নিছকই খেলা মাত্র,
প্রেমের মৃত্যু নেই তাইতো যন্ত্রনা চিরন্তন ।
কিছু বিশ্বাস বদলায় জীবন, কিছু করে নিঃশেষ
ভালোবাসা মানুষ কে শান্তি দেয়, স্বস্তি নয়
কিছু চেনা মুখ অচেনা হৃদয়
মুখোশের আড়ালে সে এক গল্প ।।

পুজো

পিয়াসা দে
BMLT, INTERN

পুজো মানে নীল আকাশে পেঁজা তুলোর ভেলা
পুজো মানে কাশের বনে হিমেল হাওয়ার খেলা
পুজো মানে ঢাকে কাঠি,আনন্দে মাতোয়ারা
পুজো মানে এদিক ওদিক দেদার ঘোরাফেরা
পুজো মানে শিকেয় থাক ঝগড়া, মারামারি
আনন্দের এই চারটে দিন কাটুক ফাটাফাটি।

"বসুন্ধরা"

"কাশফুলে দেয় সাড়া শরতের হাতছানি"

📸: সৌগত সরকার [BMLT 2ND YEAR]

গ্রামীণ স্পর্শ

📸: তানবীর আহম্মেদ [BMLT 2ND YEAR]

রঙিন ছেলেবেলা

📸: তানবীর আহম্মেদ [BMLT 2ND YEAR]

স্বাধীন

📸: তানবীর আহম্মেদ [BMLT 2ND YEAR]

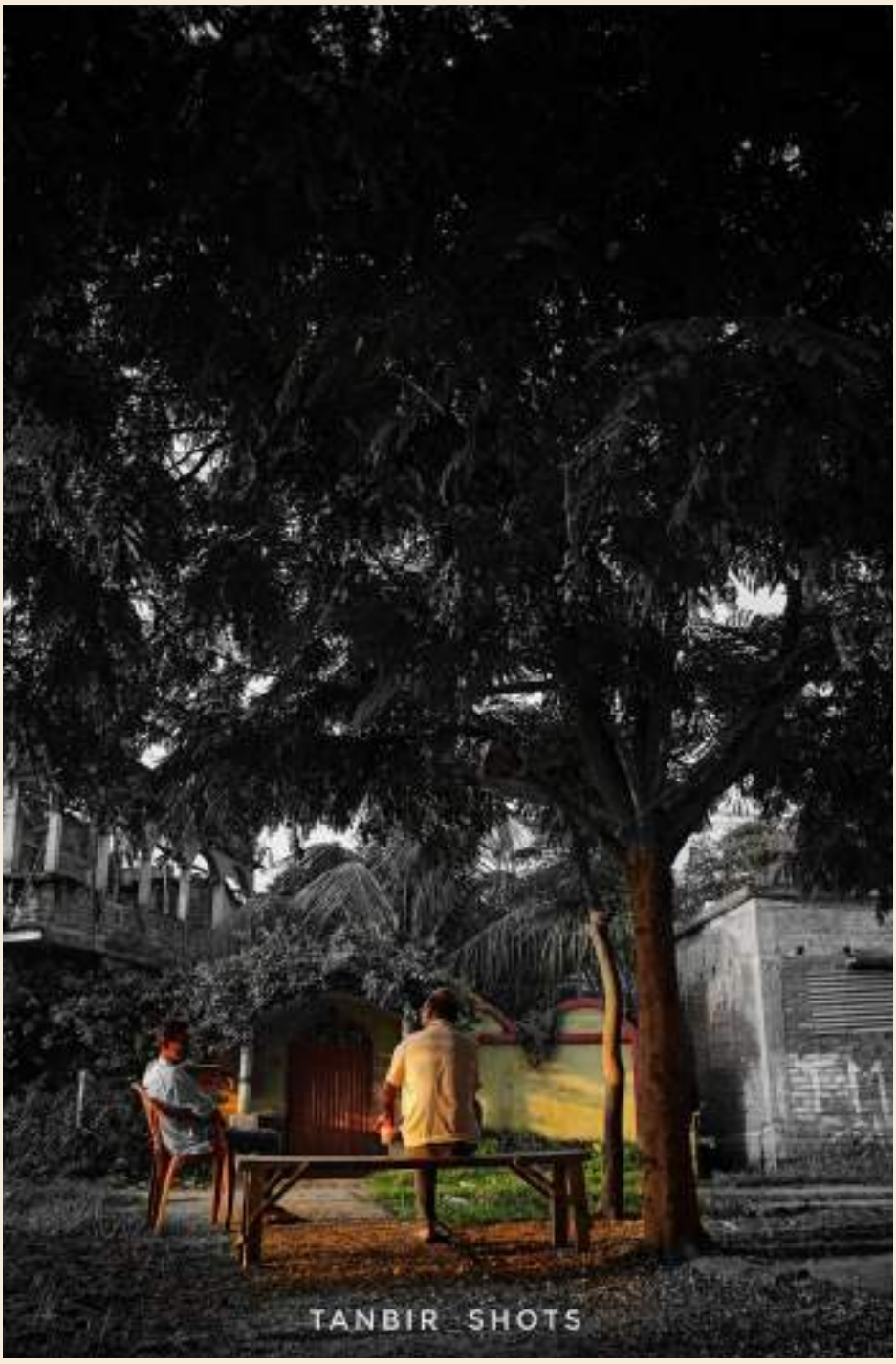

বৈকালের আড্ডা

📸: তানবীর আহম্মেদ [BMLT 2ND YEAR]

ঘরে ফেরার পালা

📸: শামীমুল হক [BMLT INTERN]

অস্তগামী

📸: শামীমুল হক [BMLT INTERN]

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব – দুর্গাপুজোর সেকাল ও একাল

শুভ্রজিৎ ব্যানার্জী

BMLT, 1ST YEAR

বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি। যদিও মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতায় বাঙালি জীবন বারবার জর্জরিত হয়ে পড়েছে, তবুও বাঙালি বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে প্রানের স্পন্দনে, উৎসবে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। প্রতিবছর আপামর বাঙালি পুজার চারটি দিনের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গোনে। বছরের সুন্দরতম ঋতু, শরৎ-এ বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি যখন সুস্নিগ্ধ লাবণ্যে অপরূপ হয়ে ওঠে তখনই অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপুজা। এই শুভলগ্নে প্রকৃতি হয়ে ওঠে নির্মেঘ, আকাশ হয়ে ওঠে সুনীল এবং মাঠে নির্মল বাতাসে দোদুল্যমান শ্বেত-শুভ্র কাশফুলের মোহময় দৃশ্য বাঙালি মনকে আবিষ্ট করে। অতীতে বাঙালির উৎসব এর মধ্যে জাঁকজমক বা আড়ম্বরের প্রাধান্য ছিল না। তবে ছিল প্রাণের স্পন্দন। সেকালে ভোরের বেলায় শিউলি ফুল কুড়ানোর মাধ্যমে দিন শুরু হতো। মহালয়ার দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে রেডিয়ো-তে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহালয়া শোনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জীবনে পিতৃপক্ষের অবসান ঘটে দেবীপক্ষের সূচনা হতো। তখন বর্তমানের মতো মোবাইল বা টিভি ছিল না। তাই টিভির সামনে বসে মহালয়া দেখার রীতি বা রেওয়াজ কোনটাই ছিল না। অতীতে পূজা ছিল মূলত বনেদি বাড়ি এবং রাজবাড়িকেন্দ্রিক। বর্তমানের মতো সমস্ত পাড়ায় পুজা এবং প্যান্ডেলের চল ছিল না। আধপেটা খেয়ে থাকা দরিদ্র মানুষ বনেদি বাড়িতে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ার আশায় প্রতিমা দর্শন করতে যেত। অতীতের উৎসব পরিপূর্ণ ছিল মানুষের নিষ্ঠায়, একে অপরের প্রতি কল্যাণকামনায়। সেকালে উৎসবের মধ্যে ছিল না অর্থকৌলিন্যের রেষারেষি। পরস্পরের সহযোগিতায় সেকালে একের উৎসব সহৃদয়তার গুনে হয়ে উঠেছিল সকলের উৎসব। বর্তমানে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মন-মানসিকতায় এসেছে পরিবর্তন। বর্তমানে দুর্গাপুজার মধ্যে নেই আর নিষ্ঠা, কল্যাণকামনা। শুধুই বেড়ে চলেছে জাঁকজমক ও আড়ম্বর। বর্তমানে বিত্তশালী মানুষ পুজোয় বহু মূল্যবান বস্ত্র ও গায়ে সুগন্ধি মেখে প্রতিমা দর্শনে বেরোচ্ছে। মানুষের মধ্যে নেই আর সহৃদয়তা, বেড়ে গেছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা আর নিজেকে জাহির করার প্রবণতা। পাড়ায়-পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে নতুন নতুন পুজা মন্ডপ। সেখানে নতুন নতুন বহুমূল্যবান 'থিম'এবং 'প্রতিমা' তৈরি হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আর চিরাচরিত ডাকের সাজের প্রতিমা দেখার মানসিকতা নেই। বর্তমানে দুর্গাপুজায় বেড়ে গেছে অর্থকৌলিন্যের রেষারেষি। আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চাঁদার দৌরাত্ম্য। তাই বর্তমানে দুর্গোৎসব সাধারণ মধ্যবিত্ত ও মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে এক দুঃস্বপ্ন স্বরূপ। পরিশেষে বলা যায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের চিরাচরিত রূপ সময়ের অতলে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে।

বিচিত্র সমাজ

প্রীতম ভট্টাচার্য

BMLT, 3RD YEAR

কী শিখিয়েছো আমাদের!
যা শিখিয়েছো তাই তো শিখেছি,ভুল ঠিক বিচার না করেই গোগ্রাসে গিলে গেছি এক একটা আচার বিচার।কখন ভীষণ ভালো সেজেছো, আবার কখন তোমারই বীভৎস খারাপ রূপ আমরা দর্শন করেছি।
সেই ছোট্ট বেলা থেকে যা শিখিয়েছো তাই তো গিলেছি শুধু, আবার নিজের স্বার্থের জন্য নিজেই বদলে দিয়েছ সেসব নিয়ম।
ভালো ভালো করে খারাপ গুলোকে জানতে না দিয়ে কী বীভৎস ভুল করেছো জানো? তাতে আমাদের ভালো খারাপের সম্যক জ্ঞান হয়নি এখনো!
অন্ধকারকে ভয় দেখিয়ে, জীবনটাকেই ভয়ে রূপান্তরিত করে দিয়েছো,মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে ভয় না পেতে শিখিয়েছো! সত্যি কী বিচিত্র চিন্তা ভাবনা।
জীবনটাকে খাঁচায় আটকে দিয়ে উড়তে দেওয়ার স্বাদ বোঝাতে চেয়েছো, হয়েছো সফল!
নিজেরটা বুঝে নিতে শিখিয়ে, অন্যকে ভালোবাসতে ভুলিয়ে দিয়েছো!আবার দিন শেষে তোমার মুখেই শোনা গেছে স্যামাধিকার এর বাণী।
বিভেদের পাঁচিল তৈরি করে পাঁচিল ভাঙতে বলেছো,কে বলেছিল তোমায় পাঁচিল তুলতে?
কিছু মানুষরূপী অমানুষের হাতে ছুরি তুলে দিয়ে জীবন নিতে শিখিয়েছো,আর যারা মানুষকে বাঁচাতে হাতে ছুরি তুলে নিয়েছে, তাদের নির্দ্বিধায় গায়ে হাত তুলতে শিখিয়েছো।
নিজের মা-বোনকে সম্মান করতে শিখিয়েছো,কিন্তু ভুলিয়ে দিয়েছো বাকি মেয়েরাও কারো না কারো মা-বোন।
নিজের বাবা-ভাই'কে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছো, কিন্তু অন্য ছেলেরাও যে কারো বাবা, কারো ভাই তা বুঝতে শেখাও নি।
মানুষেকে বিশ্বাস করতে শিখিয়ে তুমি দেখিয়ে দিয়েছো, মানুষই বিশ্বাসঘাতকতা করে।
নারী'কে ভোগ্যপণ্য করে উপস্থাপন করে, তুমি ফেমিনিজম নিয়ে বুলি আওরেছো।
তুমি পরকীয়া প্রেমের গল্প শুনিয়ে, ফিসফিস করে বলেছো এসব নাকী পাপ।
মাসিকের দিন মন্দিরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছো,সেই মন্দিরে আবার দেবী'দেরও স্থান দিয়েছো।
তুমি নিজের মেয়েকে সুখী দেখতে চেয়েছো, অন্যের বাড়ির মেয়েটা যে তোমার বাড়িতে বৌ হয়ে এসেছে তাকে সুখী দেখতে চেয়েছো?
নিজের যত খুঁত সব চাপা দিয়েছো, অন্যের একটা খুঁত খুঁজে পেলে তাকে আপমান করতে ছাড়োনি।
তুমি পেটের দায়ে বেশ্যা বৃত্তি শিখিয়েছো,আবার তাদেরই তুমি ঘৃণার চোখে দেখতে শিখিয়েছো।
মানুষকে যুক্তিবাদী করে তুলতে চেয়ে, নিজেই পেছন থেকে ছুরি চালিয়েছো,
ভালোবাসার নামে মানুষের মনে পুঁতে দিয়েছো, ঘৃণা আর প্রতিহিংসার বীজ।
স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে আরও পরাধীন করে দিয়েছো।
দেশ'টাকে মা বলে পুজো করে, তাকেই টুকরো টুকরো করেছো।
তুমি নিজেই ঈশ্বর আল্লাহ্ সৃষ্টি করে বলেছো,তারাই নাকী আমাদের সৃষ্টি করেছেন।
তুমি গিরগিটির রঙ বদলানো দেখে আশ্চর্য হয়েছো, কিন্তু নিজের চরিত্র নির্দ্বিধায় শত শত বার বদলে গেছো।
তুমি বলেছো,প্রাইভেট সেক্টরেও চাকরি করেও সংসার চলে,জ্ঞান দিয়েছো ব্যবসা করে নিজের পা'য়ে দাঁড়াতে,কিন্তু নিজের মেয়ের জন্য সরকারি চাকুরিজীবী ছেলে খুঁজেছো।
তুমি পুণ্য অর্জন করার নামে মানুষকে দিয়ে জঘন্য অপরাধ করিয়েছো।
তুমি নিজেকে মহান প্রমাণ করতে গিয়ে, নিজেকেই স্বার্থের কাছে বেঁচে দিয়েছো।
তুমি নিজের বানানো নিয়মে আধ্যাত্মবাদের চাদরে মুড়ে মানুষকে পাপী বানাতে চেয়েছো,তার বিনিময়ে নিজে কতটা পুণ্য অর্জন করেছো?

এই তুমি'টা আসলে কে? যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের স্বার্থে নিয়ম তৈরি করেছে আবার ভেঙেছে, এই সমাজ আর সমাজ'টা কাদের নিয়ে বলুন তো,আমার আপনার মতোই মানুষকে নিয়ে,সমাজ বদলানোর আগে নিজেদের বদলানো দরকার,সমাজ এমনি বদলে যাবে।

The Bittersweet Journey of Love

Rintu Deb
BMLT, 2nd year

In the heart of Kolkata, the city of joy, a chance encounter changed the lives of two strangers forever. Abhirup and Paromita, as they would soon come to know each other, met one warm evening in a charming coffee house tucked away in the college streets of North Kolkata. A simple conversation turned into hours of laughter, sharing stories, and a connection that felt like destiny. Paromita, her eyes reflecting the vibrant hues of the city, was instantly drawn to Abhirup's infectious happiness. He seemed to have absorbed the essence of "The City of Joy," making him the happiest person on the streets of Kolkata. As days turned into nights, they discovered that their conversations flowed effortlessly, and their budding romance felt like a fairy tale come true.

The Honeymoon Phase: In a city where every evening is a celebration of culture, Abhirup and Paromita explored the romantic spots that make Kolkata a city of love. Their nights became their playground as they strolled hand in hand along Princep Ghat, their hearts swaying with the gentle waves of the Hooghly River. They shared their deepest feelings while watching the iconic Howrah Bridge shimmer in the moonlight. Schedules were adjusted to accommodate each other's needs, and their smiles were most radiant when they exchanged heartfelt texts or dined at the charming Flurys on Park Street.

The Reality Check: However, like many relationships, the honeymoon phase eventually began to wane. Abhirup and Paromita noticed that their jokes, once a source of endless amusement, reached their saturation point. Ego crept in, causing petty annoyances to spark disagreements that turned into heated arguments, even as they watched the sun set behind the Victoria Memorial.

The Struggle with Possessiveness: In a city that cherishes individuality and freedom, over-possessiveness started to make Paromita feel like she was in a suffocating jail. She found herself policing Abhirup's choices, criticizing his wardrobe, and even questioning his independence. Their once sweet moments became tainted with disrespectful taunts, leaving a bitter taste in their mouths, a stark contrast to the sweet rasgullas found on every corner in the city.

Fighting the Poison: Their relationship seemed to be drowning in a sea of fights, going towards the rush-hour traffic on Park Street. Angry texts in the morning were followed by exhausting explanations at night, piling on more stress. They interfered with each other's personal space, forgetting that there were many other romantic spots to explore in Kolkata, such as the serene Prinsep Ghat or the tranquil Botanical Gardens.

The Dramatic Turns: Sometimes, their arguments took dramatic turns, creating scenes that neither of them could forget, much like the dramatic performances at the annual Durga Puja celebrations. At the peak of their turmoil, Paromita found herself wishing for a return to the days when they were happy and carefree, much like the young couples dancing in the Durga Puja pandals.

The Brutal Truth: But the distance between them had grown far beyond their limits, as distant as the serene banks of the Vidyasagar Setu from the busy streets of Esplanade. They had become worse than strangers, two people who couldn't recognize the love they once had, even amidst the grandeur of the Marble Palace and the peacefulness of Rabindra Sarobar. The brutal truth of their relationship was that it looked beautiful in the beginning, but as the fairy tale phase ended, they had lost the connection that had once brought them so much joy in the City of Joy.

Finding Happiness Within: In a city that finds happiness in simplicity and celebrates Durga Puja, both Abhirup and Paromita learned that happiness shouldn't solely depend on another person, much like finding solace in the gentle sound of the flowing Ganges. They discovered that being content alone was a valuable lesson. Perhaps someday, they would find a way to rekindle the happiness they once shared, perhaps during a sunset at Eco Park or a stroll at the Botanical Gardens, but for now, they had to focus on finding happiness within themselves, amidst the colorful and culturally rich backdrop of Kolkata.

Conclusion: The story of Abhirup and Paromita in the vibrant city of Kolkata reminds us that relationships, while beautiful and rewarding, can also be challenging. The initial bliss may fade, but with open communication, empathy, and a commitment to personal growth, couples can navigate the rocky phases and rediscover the love that brought them together in the first place. Most importantly, they can learn to find happiness within themselves, amidst the romantic spots that make Kolkata a city of love.

Illusion in the name of teenage

PRAMOD POLLEY
BMLT,INTERN

Adolescence is a transition period for both girls and boys which is essential to step into adulthood from their childhood. In true sense, it acts as a bridge which commutes between immature and mature personality of every individual. It starts at the age of 13 and lasts upto 19 years. If the inevitable spirit them is utilised and nourished properly, it can be the golden era of their lives.

Teens start to encounter changes both psychologically and physically which are linked to adulthood. They explore themselves from every angle and some of them relate themselves with some frictional characters of some stories while some can't. They begin to express themselves, become opinionated and try to take responsibilities, develop critical-thinking ability. They learn to handle academic stress and peer pressure as well as future tension also chases them to establish their own identity.

At the beginning of this period, they hardly can adjust themselves with the sudden changes which often leads to anxiety. Hesitation to express their problems and feelings to others mainly to parents makes them lonely. Due to extreme emotions and lack of vision, they mostly choose wrong things for them and sometimes carry the burden for whole life. Poor self-esteem and potential some get eliminated from the race which ultimately leads to depression and even to permanent deletion from the chapter of society.

Time has changed and the way of thinking has also evolved, still adolescents has to suffer mentally. Some people treat them like children while some treat like adults which is also neither expected nor appropriate. One should be there to teach the good and bad things and listen them carefully"listening is more important than giving advice". A good friend circle is very necessary for a teenager while a low quality friend circle acts as a curse"if three friends are millionaires from a friend circle of four people, the fourth one will also be a millionaire!".

Communication,family,finance and health;though these things aren't not included in education system, these are the commonest but most avoided things"Who is healthy has hundred other wishes but who is sick has one wish only". Parents should also update themselves with the evolutionary modern era, this may seem disgraceful but for a teenager, he/she would like to follow up the advices from the individuals who are also updated with the modern technologies like them.

So, how did you enjoy your illusion?

A special thanks to: Shrijon Basu.

নারী ও সমাজ

পল্লবী চ্যাটার্জি
BMLT,BSSPS,
(BIOCHEMISTRY FACULTY)

এ মা! মেয়ে হয়েছে,তাও আবার এত কালো? তা ,হে গো, কোনোদিন ও বিয়ে দিতে পারবে? আর ধরে নিলাম যদি কেউ দয়া দেখিয়ে রাজিও হয় তাহলে তো বিয়ের আগে কা ঁড়ি টাকা চাইবে।কী করবে তখন? তোমাদের তো আবার জানি নুন আনতে পান্তা ফুরায়। কন্যা সন্তান যখন গরীব পরিবারে জন্ম নেয় তার পরিবার কে এমন অনেক কথা শুনতে হয়। তারপর দিন কাটতে কাটতে মেয়েটি বড় হতে থাকে, পড়াশোনা করে এক একটি গন্ডি পার করে অবশেষে যখন সে তার স্বপ্নের পথে এগিয়ে যায় তখন প্রতি পদক্ষেপ তাকে দমিয়ে দেই।তবুও হার না মানা যোদ্ধা যখন সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে নিজের স্বপ্নপূরণ করে সেই গ্রাম এর ই বি ডি ও হয়ে চাকরিতে প্রবেশ করে।তখন সেই প্রতিবেশী লোকের মুখে আবারও শুনতে হয়, তোর মেয়ের যোগ্য পাত্র কি আর এত সহজে পাওয়া সম্ভব? মেয়ে কি আর তোর যে সে মেয়ে নাকি? বি ডি ও বলে কথা! শুধু জিন্স,সিগারেট নয় সমান অধিকার সমান মর্যাদা বলতে এটা বুঝতে হবে সমাজকে মেয়ে মনে কাধের বোঝা নয়,আমাদের উচিত মেয়েদের কে বোঝা।সঠিক সুযোগ ও ভরসা পেলে শুধু ছেলে নয় ,মেয়ে রাও বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। ছেলে কে আলাদা মানুষ, মেয়ে কে মেয়েমানুষ না বলে দুজনকে সন্তান হিসেবে মানুষ করুন,দেখবেন একদিন গর্ব করে বলবেন,"ও আমার মেয়ে,"! কন্যা সন্তান কখনো অভিশাপ হয়না,কন্যাসন্তান সৃষ্টিকর্তা এর আশীর্বাদ। আর বলুন তো সাফল্য কি সুন্দর মানুষের আচরণ বদলে দিতে পারে তাই না? আর সময় কি সুন্দর মানুষ চিনতে শেখায় তাই না?

হোস্টেল জীবন

সেখ রহমত আলি

BMLT, 2ND YEAR

হোস্টেল জীবন নিয়ে যদি কিছু বলতে চাই তাহলে তার আর শেষ হবে না, তাই একটু সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি।

হোস্টেল জীবন হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনের থেকে একদমই আলাদা একটা জীবন, যে জীবনে কোনো নিয়মের বেড়াজাল নেই। এই হোস্টেলের চার দেয়ালের মাঝে আপনারা পেয়ে যাবেন দেশের নানান প্রান্তের ছাত্রছাত্রীদের। এটি এমন একটি স্টেশন যেখানে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ছাত্রছাত্রী একত্রিত হয়। একজন পরিপক্ক মানুষ হওয়া আর মানুষ চেনার দক্ষতা অর্জন করার জন্য একটা সেরা জায়গা হচ্ছে হোস্টেল জীবন। হোস্টেলে আসার পর ছেলেরা যেটা সব থেকে আগে শেখে সেটা হচ্ছে নিজের দায়িত্ব নেওয়া আর রান্না শেখা কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। প্রথম প্রথম সবারই একটু মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয় কিন্তু আস্তে আস্তে কেমন যেনো সবই নিজের মনে হয়, সবার সাথে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্বও হয়ে যায়। কেউ কেউ খুব ভালো বন্ধু হয়, কেউ কেউ আবার প্রিয় বন্ধুও হয়। কিন্তু এই ভালো বন্ধু এবং প্রিয় বন্ধু খুব ঘন ঘন পরিবর্তনশীল। এখানে যে ছেলেটা প্রথমদিন এসে ভাজা মাছটা উল্টে খেতে পারতো না সে এক বছর পর জুনিয়রদের মাছ ভাজা শেখায়। হোস্টেলে প্রায় সব ধরনের কাজে দক্ষ ছেলেমেয়েদের পেয়ে যাবেন, যেমন কেউ নাচে দক্ষ,কেউ গানে, কেউ আবৃত্তিতে,কেউ অভিনয়ে, কেউ কেউ আবার এডিটিং এ। এর ফলে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আলাদা করে কাউকে প্রয়োজন হয় না । হোস্টেলে ছাত্রছাত্রীরা সারা বছর নাচ,গান,আড্ডা দিয়েই কাটিয়ে দেয় (ব্যতিক্রম তো কিছুজন থাকেই) কিন্তু পরীক্ষার ঠিক একমাস আগে পড়া তৈরি করে ফেলে এবং পাস করে যায় (ভালো রেজাল্টের সঙ্গে),এইটুকু ট্যালেন্ট হোস্টেলে থেকে তৈরি হয়ে যায়। হোস্টেলাররা পড়াশোনার পাশাপাশি জীবনমুখী সমাজের সঙ্গে লড়াইটাও খুব ভালো ভাবে শিখে যায়। আর একটা জিনিস শেখে সেটা হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানো।'একে অপরের জন্য' এটা বুঝতে শেখে। তাই এখন চাকরির ইন্টারভিউ এ জিজ্ঞেস করা হয় হোস্টেলার ছিলে কিনা। আমি মনে করি একজন ছেলের বা মেয়ের অন্তত কলেজ লাইফটা হোস্টেলে থেকে কাটানো প্রয়োজন তাতে ভবিষ্যতে অনেক উপকার হবে । হোস্টেল জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই এক্কা-দোক্কাময় নাটকীয় সমাজে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

স্বল্পসুখ ভয়ঙ্কর

শামীমুল হক
BMLT, INTERN

[স্মার্ট ওয়াচের ভাইব্রেশনে সম্বিত ফিরে পেলাম, রাত দুটোয় এলার্ম দেওয়া ছিল হয়তো, হ্যাঁ ওই সময়ে তো ঘুমাতে যায় আমি। আজ সন্ধ্যায় পেটে একটু বেশি পড়ে গেছে আর কি। টেবিলে খোলা ল্যাপটপে ফেসবুকে ব্যস্ত ছিলাম। আমার নাম সমীরণ প্রামানিক, আমি একজন উড়তি বয়সী সাংবাদিক, করোনার সময় আমার বিভিন্ন কার্যকলাপ সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচুর ভাইরাল হয়েছিল। ফেসবুকে আমার বেশ নাম, যে কোন পোস্টে লাইক কমেন্টের বন্যা বয়ে যায়। মাস দুয়েক আগে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে ফেসবুকে সেলিব্রেটিদের মত ব্লু টিক লাগিয়েছি নামের পাশে। সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলোয়ার্স প্রায় ত্রিশ হাজার ছুতে লাগলো । কিছুদিন হলো বেশ সমস্ত ব্যাপারে প্রতিবাদ করাটা আমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে , সে বেকার দের চাকরি নিয়ে লড়াই হোক বা নারী নির্যাতন। যে কোন ঘটনাতেই আমার পোস্ট করা কবিতা ঝড় তুলবেই, আর শহরের মোমবাতি মিছিলের একদম সামনে, আর তারপরেই প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ।

আজকে মাত্র দু'ঘন্টা ফেসবুক আর সমস্ত খবর থেকে দুরে ছিলাম, আর এমন একটা ঘটনা থেকে কত দুরে চলে গেছি। গ্রামবাংলায় আবার এক নারীর গণধর্ষণ, ফেসবুকে একের পর এক পোস্ট। এর আগে প্রতিবার এতক্ষণে আমার পোস্টে শতাধিক লাইক কমেন্ট পড়ে গেছে। এই কিছুদিন হল আমাদের বাড়ির পাশে এক ছোকরা আমার মতই ঠিক প্রতিবাদী কবিতা গল্প লিখছে , কনটেন্ট কপি করছে আমার , দিয়েছি কয়েকদিন আগে একটা ফেক আইডি থেকে কমপ্লেন ঠুকে, আবার করতে হবে। না আর দেরী করা যাবে না, এখুনি একটা রক্তগরম কবিতা পোস্ট করতে হবে এই গণধর্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার প্রোফাইল রিচ বাড়াতেই হবে । নাহ, আজ মাথাটাও বিশ্বাসঘাতকতা করছে, একটা শব্দও আসছে না, সিগারেট ধরালাম, জল খেতে গিয়ে দেখি বোতলটা ফাঁকা । জল দিতে বললাম দেখি, কোন সাড়াশব্দ নেই, অগত্যা উঠতেই হলো । টলতে টলতে পাশের ঘরে এসে দেখি প্রায় উলঙ্গ হয়ে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। যন্ত্রণায় মুখটা বেঁকে আছে। ঘণ্টা খানেক আগেই আমি এ অবস্থায় ছেড়ে গেছি। আমাকে দুহাত জড় করে বলেছিল - দোহাই আজ আমায় ছেড়ে দাও, শরীরটা আজ খুব খারাপ, তাছাড়া দুই মাস হলো আমার শরীরে আরও একটা প্রাণ বেড়ে উঠছে, এখনতো থামো। না আমি থামিনি, নেশার মধ্যে স্বল্পসুখ পাওয়ার জন্যে আমার সমস্ত শারীরিক খিদে মিটিয়ে তারপর ছেড়েছি, পুরুষ মানুষ বলে কথা । ঠিক করেছি, সে একটা নারী ছাড়া আর কিছু নয়, যতই হোক দুই মাসের প্রেগনেন্ট, আমার স্ত্রী আমাকে শারীরিক সুখ দিতে বাধ্য । নাহ, অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, একটা জলের বোতল নিয়ে চললাম গ্রাম বাংলার ওই গণধর্ষণের প্রতিবাদে একটা নতুন কবিতা লিখতে।

লিখতে বসে মাথা প্রচুর ঘুনঘুন করছিল,ভাবলাম একটু গরম চা খেলে হয়তো কেটে যাবে। রান্না ঘরে গিয়ে ওভেন চালিয়ে দিয়ে আর গ্যাস লাইটার চোখে দেখতে পাই না, শেষমেষ আমার মত মাতালের পরিণতি হয়ে দাঁড়ালো রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট করে মৃত্যু ।

পরদিন সকালে হইচই পড়ে গেল এক বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী উভয় খুন , পাশের বাড়ির ওই নতুন ছোকরা টাও নিজের স্মার্ট ফোন টা নিয়ে বাকি সব সংবাদিক দের সাথে হাজির। খবরের চ্যানেলে হেডলাইন হল "কোনো অজ্ঞাত ধর্ষণকারীর দল রাতের বেলায় সমীরণ প্রামানিক নামক ব্যাক্তির বাড়ি ছুকে তার স্ত্রী সুইটি প্রামানিক কে গণধর্ষণ করে হত্যা করে এবং একই সাথে সমীরণ কে পুড়িয়ে খুন করে"

শশীকান্ত

ডা: কনাদ বাগ

আড়ি পেতে শোনা শশীকান্তের বহুকালের স্বভাব। ঠাম্মা বলত, এমন কান-খড়কে ব্যাটাছেলে জন্মে দেখিনি। কান-খড়কে বলতে ঠাম্মা আড়িপাতা স্বভাবের কথা বললে শশীকান্তের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তার সাথে ব্যাটাছেলের মর্যাদাকে আঘাত করার কোন মানে হয়। আড়ি পাতা কি মেয়েদের একচেটিয়া অধিকার। এ রকম একটা প্রবাদ আছে বটে ইংরেজিতে, কিন্তু সেটা তো ঠাম্মার জানার কথা নয়। ঠাম্মাকে ভালোবেসে শশীকান্ত তাও এটা মেনে নিতে পারতো। কিন্তু শশীকান্তর অন্য স্বভাবটা সম্বন্ধে ঠাম্মা যখন বলল পেট পাতলা তখন শশীকান্ত ঠাম্মার সাথে ব্যাপক ঝামেলা শুরু করে দিল। দেখো ঠাম্মা আমায় যা দেওয়া হয় আমি তাই খেয়ে নি। কোন ঝামেলা করি না। যা খাই তাই হজম করে ফেলি। তুমি আমায় পেট পাতলা বলতে পার না। ঠাম্মা পেট-পাতলা কথাটার মানে কি সেটা নিয়ে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করেছিল শশীকান্ত কোন কথা শুনতে রাজি ছিল না। শশীকান্ত বলল তুমি আমায় কান-খড়কে বলতে পারো কিন্তু পেট-পাতলা কখনোই নয়। শেষ পর্যন্ত রফা হল ঠাম্মা শশীকান্তকে কান-খড়কে এবং ঠোঁট-পাতলা বলতে পারবে তাতে লোকে যা বোঝে বুঝবে কিন্তু ব্যাটাছেলের মর্যাদাকে আঘাত করা যাবে না। কপালে চুমু খেয়ে ঠাম্মা বলল সাবধানে থাকিস শশী।

এহেন দুই স্বভাবের রাজযোটক কম্বিনেশন যে কতটা মারাত্মক হতে পারে, তার প্রমাণ শশীকান্ত, জীবনে বহুবার পেয়েছে। তবু কেন জানি ওর কানেই সব কথা বাজত, আর পাতলা ঠোঁটে তৎক্ষণাৎ তা প্রতিধ্বনিত হত। অনেক চেষ্টা করেও শশীকান্ত তার কান আর ঠোঁট কে বশে আনতে পারে নি। যে কথা শুনতে নেই সে কথা শশী ঠিক শুনে ফেলতো। আর যে কথা বলতে নেই বলে ফেলতো সে সব কথা।

ফাঁকা ক্লাস ঘরে পাশের বাড়ির এগারো ক্লাসের ছাত্রী পারুলদির ফিসফিসানি কথা, ঠিক সময় মত ওর কানে বেজেছিল। আই লাভ ইউ কথাটার মানে শশীকান্ত তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। ক্লাস ফোরে বোঝার কথাও নয়। এখনও যে খুব একটা ভালো বোঝে এমনটাও নয়। ফাঁকা ক্লাসরুমে খাতার মলাটে চুমু খেতে খেতে পারুলদি কেন আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ বলছিল কে জানে! অবাক শশী পারুলদি কে গিয়ে জিজ্ঞেস করে বসল, দিদি অমন করছো কেন গো! পারুলদি বলল, আরে এটা অঙ্ক খাতা। আমার অঙ্ক করতে ভালো লাগে, তাই। অঙ্কে কাঁচা শশী বলল, সে আবার কি? অঙ্ক করতে কারুর আবার ভালো লাগে নাকি? পারুলদি বলল, ও তুই বুঝবি না।

ঠোঁট-পাতলা শশীকান্ত, নতুন অঙ্ক টিচার অমিত স্যারকে কথাটা বলে ফেলল। ফলে, অঙ্ক ক্লাসে শশীর বিড়ম্বনা গেল বেড়ে। অঙ্কে কাঁচা শশীকে পাকা করার দায়িত্ব, অমিত স্যার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। অঙ্কের প্রেমিকা পারুলদি, এগারো ক্লাসের পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করে বারো ক্লাসে উঠল, প্রমোটেড উইথ কনসিডারেশান। বারো ক্লাসের বোর্ডের পরীক্ষায় পারুলদি কান ঘেঁষে অঙ্কে পাশ করে কলেজে ভর্তি হল। কিন্তু, শশীর ছেনস্থা কিছুই কমল না। ক্লাস নাইনে উঠে শশী দেখল, অমিত স্যারটাকে যতটা খারাপ ভাবত শশী, স্যার ততটা খারাপ নয়। আসলে, মানে স্যার বেশ ভালোই। এর কারণ ঠিক কী, তা শশী জানে না। তার অঙ্কে সড়গড় হয়ে ওঠা না পারুলদির সাথে অমিত স্যারের বিয়ে। স্যার বলেছিল শশী চাইলে তুই বড় হয়ে অঙ্ক নিয়েও পড়তে পারিস।

মানব সভ্যতায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় মানুষের জীবনে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় ইতিহাস খাতায়। ক্লাস ফোরে দেখা পারুলদির অঙ্ক খাতার পুনরাবৃত্তি শশী দেখতে পেল ক্লাস টেনে উঠে। সেই ফাঁকা ক্লাস ঘর। পারুলদির জায়গায় আয়েশা। সেই শশীকান্তর খড়কে কান, সেই একই শব্দবন্ধ। আই লাভ ইউ। আর সেই অস্ফুট চুম্বন নিষ্কন। সেই শশীকান্তের পাতলা ঠোঁট। খাতার মলাটে চুমু খেয়ে, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ করছিস কেন? সেই একই উত্তর - ও তুই বুঝবি না। তফাৎ শুধু এইটুকুই, অঙ্ক নয়, খাতাটা ছিল ইতিহাসের। মলাটে লেখা ছিল নাম - শশীকান্ত ভট্টাচার্য।

অঙ্ক স্যার বলেছিল, শশী চাইলে তুই বড় হয়ে অঙ্ক নিয়েও পড়তে পারিস। শশীকান্ত অঙ্ক স্যারের কথা রেখেছিল। আয়েশা কিন্তু বলে নি শশী চাইলে তুই বাকী জীবনটা আমার সঙ্গে কাটাতে পারিস। আয়েশা যেহেতু বলেনি তাই শশীর কোন দায় ছিল না। কিন্তু, ও তুই বুঝবি না - কথাটা শশীর ধুকপুকানি বাড়িয়ে দিয়েছিল কয়েক গুণ। কান বা ঠোঁট কে যে নিয়ন্ত্রন করতে পারে না, সে করবে হৃদয়ের নিয়ন্ত্রন! শশীর অনিয়ন্ত্রিত হৃদয় শুধু শশীর জীবনে নয়, আয়েশার জীবনেও বিড়ম্বনা এক দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করল। দুজনকে ঘর থেকে বার হতে হল। ঠাম্মা তখন বিছানা নিয়েছে। অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তনের মাঝে শশীকান্ত ঠাম্মার সাথে দেখা করে বলল ঠাম্মা চললাম। মৃদু কেঁপে উঠল ঠাম্মার ঠোঁট দুটো। শশীকান্তর খড়কে-কান শুনতে পেল - সাবধানে থাকিস শশী। আজন্ম চেনা বাসা থেকে প্রবাস। দেশের প্রত্যন্ত পশ্চিমপ্রান্তের সে প্রবাসে ট্রেনে আগুন মৃত্যু নিছিল। সেখান থেকে খড়কুটোর মত কত ঘাটে, আঘাটায় ঠেকে আর ভেসে আবার ফিরে এসে দেখা সেই তো একই আছে স্বদেশ।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় ইতিহাস খাতায়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় নদীর পশ্চিমকূলে।

ক্লান্ত আয়েশার মাথাটা শশীকান্তর বাঁ কাঁধে লটকে পড়ে আছে। ওর কাঁচা পাকা চুল শশীকান্তর দৃষ্টিপটে ক্রমাগত জাল বুনে চলেছে। পতিত পাবণী নদীর পশ্চিমকূল। সামনে ছলাৎ ছল। ওপারে বিপদতারিণী মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি। সব ছাপিয়ে শশীকান্তর খড়কে কান আবার জেগে ওঠে। পেছনের কয়েক ধাপ ওপর থেকে মিহি সুরেলা গলায় আকুল আর্তি। আমাকে তুই ভুলে যা সাদিক, জাতে ধর্মে মেলে না। বাড়ি থেকে মেনে নেবে না। থৈ থৈ জল ছলছল এক অপরিণত পুরুষ কণ্ঠ বলে ওঠে, তা হয় না অনন্যা, তা হতে পারে না। সব হয় সাদিক, সব হয়। সময় সব ঠিক করে দেয়। তুই আমায় ভুলে যা। সাদিক বলে ওঠে, তুই বলছিস। তুই বলছিস, আমি তোকে ভুলে যাব। ঠিক আছে, আর একবার বল। আর একবার তুই আমাকে বল, তোকে ভুলে যেতে। দেখিস, আমি পারব। ঠিক পারব। শুধু তুই আর একবার বল।

অনন্যার অখণ্ড নীরবতা চরাচরকে গ্রাস করতে থাকে।

তোর টিমে তোর পাশে

সৌমিত সাঁতরা
BMLT, 3RD YEAR

– "কিছু সমস্যা নেই তো ভাই...!?"
– "না না, একদম ঠিক আছে।"

আমি মুখে যদিও কিছু বললাম না, তবে মনে মনে জানি এই বদ্ধ চার চাকা গাড়ি আর A.C. এর হাওয়া ঠিক সইছে না। এত দিন ট্রেনেই উত্তরপাড়া যাওয়া - আসা করেছি কিন্তু স্যার এর পড়ানোর সময় রাতের দিকে হয়ে যাওয়ার জন্য এই গাড়ির বন্দোবস্ত। গাড়িটি আসলে অন্য একটি বন্ধুর, তাতে আমি সহ আরও দুজন স্থান পেয়ে গেছি কারণ আমাদের সমস্যা একই। রাতে একটা ট্রেন মিস হওয়া মানে এক ঘণ্টার আরও অপেক্ষা, বাড়ি ফিরতে রাত বারোটা। এই সমস্যা নিবারণ তো করা গিয়ে ছিল কিন্তু এখনো আমার অভ্যাসগত হয়ে উঠেনি। সেই রকমই একটি দিন, আমরা পড়া থেকে বাড়ি ফিরছি গাড়িতে। গাড়িটি বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছালো, তার পর সেখানে রাখা আমার সাইকেল নিয়ে আমি চললাম আমার বাড়ির দিকে।

বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত দশটা। বাড়ির লোকের কাছে এই সময়টা এখন আর অস্বাভাবিক কিছু না । মুখ - হাত - পা ধুয়ে যখন খেতে যাবো তখন একজনের ফোন এলো।আমার একটা বন্ধু ফোন করছে, হ্যাঁ সেই বন্ধু যার সাথে আমি আজ বাড়ি ফিরলাম। বেশি দেরি না করে কলটা রিসিভ করলাম ।

– "হ্যালো, রাজ...?"
– "হ্যাঁ বল..."
– "খবরের চ্যানেলটা খোল, T.V. তে..."
– "কেন বলতো..!?"
– "আরে.... তুই খোল না খবরের চ্যানেলটা..."
– "কি ব্যাপার বলতো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না..."
– "আমি জানি না, তুই খোল... তারপর দেখে বল ।"

ফোনটা কেটে দিলাম।

" এর আবার কি হলো রাত-দুপুরে " - একটু বিরক্তিস্বরে উঠে গিয়ে T.V. তে খবরের চ্যানেলটা চালালাম। বিরক্তি কেটে যেতে সময় লাগলো না বরং একটা ভয়, বিস্ময় এর ধোঁয়া ঘিরে ধরতে থাকলো। আর আমাকে নিয়ে গেলো এক পুরনো স্মৃতিতে।

বন্ধুরা মিলে সব জমা হয়েছে মাঠে । আজ উল্লাসের দিন। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা বলে কথা। আমরা সকলে ব্যাগ - বই বাড়িতে রেখে মাঠে জমা হয়েছি এক মুহূর্ত নষ্ট না করে।

ঘোরাঘুরি থেকে শুরু করে খেলাধুলা সব কিছু প্রায় করা হলো। আর আমাদের বন্ধুদের একটি গ্রুপ হয়ে গেল, রোজ বিকালে এসে ক্রিকেট খেলা হতো একসাথে।
এই রকম ভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। পড়াশোনা নেই এখন। রোজকার এর মতো আজও খেলতে গেছি কিন্তু আজ চেনা মুখ গুলোর মাঝে এক অন্য অচেনা, নতুন মুখ দেখলাম।

হ্যাঁ, একজন দাদা আমাদের সাথেই খেলবে বলে এসেছে, তারও গত কয়েক দিন আগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন আমাদের সাথেই এই খেলায় যোগ দিয়েছে । দাদাটা আমার অচেনা ছিল ঠিকই কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে কয়েক জনের কাছে সে পরিচিত এবং আমাদের স্কুলেরই ছাত্র সে।
" ব্যাস.., মিটে গেল, আর কোনো ধর্ম সংকট নেই। " - মনে মনে বললাম।
তারপর আবার কি, খেলা চলতে থাকলো আগের মতোই।

দাদা নতুন ছিল , তবে খুব কম দিনের মধ্যে মিলে মিশে একাকার। হ্যাঁ, সেটা ঠিকই যে খেলাধুলা এমন এক মাধ্যম যেটা বন্ধুত্বের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু দাদাটার নিজস্ব গুন কিছু কম নয়, বন্ধুসুলভ আচরণ আর তার থেকেও ভালো ক্রিকেট খেলার দক্ষতা - আর কি চাই । এখন সবার প্রিয় সে । সবাই তাকে নিজের দলে রাখতে চায়। প্রথম কয়েকটা ম্যাচ আমি তাকে নিজের দলে পাই নি । কিন্তু আমি তার সামনা সামনি যতবার এসেছি তাকে প্রভাবশালী হতে দিই নি। পরে অবশ্য অনেক ম্যাচ আমরা একসাথেও খেলেছি। অপ্রতিরোধ্য সেই টিম তখন। এক পক্ষে থাকার কারণে বন্ধুত্বের সাথে সাথে সম্মান টাও আসে একে অপরের প্রতি। মাস খানেক কাটলো। এখন সে আমাদেরই একজন। আলাদা করে কখনো তাকে দেখা হয়নি। খেলা চলাকালীন তো মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে 'তুই' বেরিয়ে যেত, তা সবই মজার ছলে গ্রহণ করা হতো। বন্ধুত্বের জন্য তো সব পাপেরই ক্ষমা আছে। কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিতে কোনো জিনিস স্থায়ী নয় স্বয়ং বিধাতাকে ছাড়া। তাই তারও বিদায়ের সময় এলো।
দিনটা শুক্র বার। বিকালের খেলা শেষ হয়েছে, মাঠে বসেই আড্ডা দিচ্ছি -
দাদা - "চললাম রে সব , এবার হয়তো অনেদিন পর দেখা হবে।"
আমরা সবাই - "কেন... কেন দাদা..!? কোথায় যাবে..?" হাজার প্রশ্নের ভিড়।
দাদা -"আরে থাম তোরা, বলতে দে; কলকাতার একটা নামী কলেজ এ ফিজিক্স নিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। কালই হোস্টেল এ চলে যাবো। এরপর এক সপ্তাহ পর আজকের দিনই ফিরবো বাড়ি; তখন নয় খেলতে আসবো আবার। তোরা তো আছিস, খেলিস... আবার চিন্তা কি..!!"

আমরা সবাই জানতাম একটা দিন তো পড়াশোনা শুরু হবে সবারই, তাই প্রতিদিন খেলার সুযোগ কারোরই হবে না। কিন্তু হ্যাঁ, শনি - রবি বার তো খেলাই যায়।

আমরা সকলেই রাজি হলাম। আর দাদার এই কলকাতার নামি কলেজ এ পড়ার সুযোগ পাওয়ার আনন্দ ও পালন করা হলো। সেই দিনের মধ্যে সবাই বিদায়।
কয়েক দিনের মধ্যে, আমাদের ও এগারো ক্লাস এর পড়া শোনা শুরু হয়ে গেছে...।

সেই রকমই এক, ক্লান্ত একঘেঁয়ে দিনে বাড়ি এসে T.V. খুলতেই শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। কিছু বলতে পারছি না, শুধু দেখছি আর শুনছি । খবরের চ্যানেল -এ বলছে -

– “গত বুধ বার থেকে হোস্টেল এবং কলেজ থেকে নিখোঁজ এক তরুণকে রেলে কাটা অবস্থায় পাওয়া যায় বৃহস্পতি বার এ। দুর্ঘটনাস্থল উত্তরপাড়া ও ছিন্দমোটর স্টেশন -এর মাঝের রেল পথে। ট্রেনের লোকো পাইলট তা লক্ষ করে পরবর্তী স্টেশন-এ খবর পাঠান তারপর এর অনুসন্ধান শুরু হয়।“

T.V. তে সেই তরুণ এর নাম উল্লেখ্য করা হয়েছে। যে নাম আমার খুব চেনা – “ এটা তো সেই দাদাটার নাম.... ”

– “ না না, একই নামে তো অন্য ব্যাক্তি থাকতেই পারে। কিন্তু....

কিন্তু নাম, ধাম, কলেজ সব কিছু মিলে যাচ্ছে কেনো...!!কেনো !!!? ”

T.V. তে যখন তার ছবি প্রকাশ পায় তার মৃত দেহ চিহ্নিত করে তখন আর কিসের সন্দেহের অবকাশ রাখব।

ভাব হীন দুটো চোখ কিছু দেখতে চায় না আর ; সে তো অতীতের মুহূর্ত গুলো খুঁজতে চাইছে।

খবর চলতে থাকলো.... “হোস্টেলের ছেলেদের মতে, সেই তরুণ নিজ প্রয়োজনে বেরিয়ে, উত্তরপাড়া স্টেশনে আসেন এবং হেঁটে হেঁটেই রেল পথের মাঝে তার নিজের শরীর রেখে আত্মহত্যা করেন। হোস্টেলের রুমে তার এক সুইসাইড নোট উদ্ধার করা গেছে... যা থেকে জানা যায় যে তিনি কলেজ এর পঠনপাঠন এর সাথে নিজেকে মানাতে পারেননি, তার ইংরেজি বলার অক্ষমতা, তার সঙ্গে নাম – পরিবার নিয়ে র‍্যাগিং এবং মানেজমেন্ট ও শিক্ষক দের সাহায্যের অভাব...তাকে এই পর্যায়ে নিয়ে চলে গেছেন... ”

T.V. বন্ধ হয়ে গেল...

আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

কে এই মানুষ, যার সাথে আমরা মাসের পর মাস খেলা করেছি। যে ছেলেটা এত মিশুকে, যে বন্ধু করতে জানে... বানাতে জানে, যার পড়াশোনার প্রতি কোনো দিন অভক্তি ছিল না ; তার ইংরেজি বলতে সমস্যা...!!!

এটা মেনে নেওয়া সম্ভব... “কিভাবে ? কেনো !!”

হ্যাঁ.., ঘেঁটে গেছে সমস্তটা।

আমরা তো তাকে ভুল চিনতে পারি না.... কখনই না।

এক সপ্তাহ আগে, যে বলেছিল ফিরে আসবে..., ক্রিকেট খেলতে আসবে; হ্যাঁ সে এসেছে। কিন্তু সে আমাদের সাথে খেললো না। স্বয়ং ভগবান এর হয়তো ক্রিকেট খেলার এক সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল, তাই তাকে ডেকে নিয়েছেন নিজের কাছে। তবে তার যাওয়ার আগে আমরা বন্ধুরা -ই বা তাকে খালি হাতে যেতে দিই কিভাবে..!! তাই ব্যাট, উইকেট, বল তার সাথেই পাঠিয়ে দিলাম।

কে জানে..., স্বয়ং ঈশ্বরকে সে ক্রিকেট খেলাতে কতখানি টক্কর দিচ্ছে। না কি..., সে আর ঈশ্বর একই টিমে একই সাথে খেলছে । সে খবর কারোর কাছেই নেই।

সমুদ্রের ঢেউ থেকে ছিটকে যাওয়া ছোট্ট জলকণা যেমন কয়েক মিলি সেকেন্ড -এর নতুন জীবন পায় তারপর আবার সেই সীমাহীন, সুগভীর সমুদ্রে মিশে যায় ; তেমনই সেও পাড়ি দিয়েছে সেই নাম না জানা সমুদ্রে আর....

আর হারিয়ে গেছে সেই সাগরে...

রিয়ার ইতিকথা

অরিত্রী নাথ
BMLT, 3RD YEAR

এক সপ্তাহের টানা কাজ করার পর রিয়া একটু বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। কাজ সে এমনিতেও করে কিন্তু পুরনো জায়গায় থেকে কাজ করা আর নতুন জায়গায় কাজ করার মধ্যে তফাৎ অনেক টাই। একসপ্তাহ আগে রিয়া তার পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন জায়গায় শিফ্ট হয়েছে। একে নতুন জায়গায় শিফ্ট হওয়ার ধকল তার ওপর টানা একসপ্তাহ কাজ, তাই বিশ্রামের জন্য সে একজায়গায় হেলান দিয়ে বসেছিল।

এমন সময় রিয়ার সাথে দেখা ফাজ দাদার।

প্রথমে তো সে চিনতেই পারেনি। আর পারবেই বা কি করে,জন্মের সময়েই তাকে সে প্রথম ও শেষ বারের জন্য দেখে। এখনই এই নতুন জায়গায় আবার যে দেখা হবে তা সে ভাবতেও পারেনি। জন্মের সময় রিয়ার মা মারা যায় , আর ফাজ তার মাসির মাধ্যমে জন্ম নেয়। তাই সেই সম্পর্কে ফাজ হল রিয়ার দাদা।

এখানে বলে রাখা ভালো রিয়া হল একটি ব্যাক্টেরিয়া (E.coli), যে ইন্টেস্টাইন থেকে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট এ এসেছে এবং সেখানেই তার দেখা Bacterio ফাজ এর সাথে ।

যাই হোক ফাজ রিয়াকে প্রথম দেখাতেই চিনতে পারে তাই সে নিজে এগিয়ে যায় রিয়ার দিকে।

একজন অচেনা অজানা ফাজ তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে প্রথমটায় রিয়া ভয় পেয়ে যায় কিন্তু কাছে আসতে সে তার ফাজ দাদাকে চিনতে পারে।

– " আরে বোন তুই এখানে কি করে? আমিতো জানতাম তুই Intestine এ থাকিস, খাবার ভাঙতে সাহায্য করিস...."

রিয়া তার নতুন জায়গায় সিফটিং এর খবর ফাজ কে দিতে চাইলো না তাই সেকথা বেমালুম চেপে গেল।

– " আরে আমার কথা ছাড়ো আমি এমন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। কিন্তু তুমি এখানে কেনো?? কোনো কাজে বুঝি??"

– "হ্যাঁ রে, ডিফেন্সের চাকরি পেয়েছি , স্পেশাল ফোর্স, যেখানে স্বাভাবিক ডিফেন্স এর দ্বারা পরিস্থিতি সামলানো যায় না সেখানে আমাদের ডাক পরে।"

– "তো বেশ ভালোই,কিন্তু এখানে??"

– " হ্যাঁ রে এখানেও নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে। এই সবেমাত্র এলাম দেখি খোঁজ নিতে হবে।"

– "তো বেশ।"

– "আচ্ছা বোন তুই তো আমাদের সাথে জলে থাকি তিস, তাহলে এখানে এলি কি করে??"

– "সে অনেক বড়ো গল্পঃ গো দাদা। একদিন সময় হলে বলবো।"

– "সময়! আমাদের যা চাকরি এখানে সময়ের বড্ড অভাব রে, আজ এলাম আজই যা সময় আছে।"

– "তাহলে শোনো। মা মারা যাওয়ার পর আমি আর বোন একসাথেই জলেতে ঘুরে বেড়াতাম, খেলতাম। একদিন একটা মানুষ সেই জল খেয়ে ফেললো। আমরা যেই জলে থাকি সেই জলকে মানুষ এর ভাষায় বলে contaminated water। যেটা নাকি মানুষ এর স্বাস্থের পক্ষে ভালো না।"
– "তারপর??"
– "তারপর আমি আর বোন একসাথে Intestine এ থাকতে শুরু করলাম। ভালো কাজও করতাম , খাবার ভাঙতে সাহায্য করতাম, আরো অনেক কিছু ভালো কাজ।"
– "তাহলে এখানে এলি কীকরে??"
– "মানুষের ব্যাপার কী আর বলা যায় গো! ওরা নিজের মতোই চলে। হঠাৎ এক সপ্তাহ আগে আমাদের E.coli সংগঠন থেকে বলা হল যে আমাদের কিছু জন Intestine এ আর থাকতে পারব না। আমাদের কাজ ওখানে নেই আর। আমার নামও ছিল তাদের মধ্যে তাই চলে এলাম ইউরিনারি ট্র্যাক্ট এ। বোন অবশ্য ওখানেই আছে। আমি চলে আসার সময় বড্ড কান্নাকাটি করছিল, ওর জন্যই মন টা একটু কেমন কেমন করে উঠছে মাঝে মধ্যে।"
– "হুম..".
– "আমার কথা তো শুনলে এবার তোমারটা বলো দেখি.."
– "আমার গল্পটা অনেক টাই এক শুধু...."
– "কি শুধু?"
– "আমিও ভাইদের সাথে জলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম , এমন সময় মানুষগুলো ধরলো আমাদের তারপর কিসব প্রসেসিং করে ওষুধ এর মধ্যে ছুকিয়ে দিলো, আর আমরাও চাকরি পেয়ে গেলাম
এখন আমাদের কাজ হল মানুষদের শরীরে যে সমস্ত রোগ সৃষ্টি করা ব্যাক্টেরিয়া থাকে তাদের মেরে ফেলা।"
– "তোমরা চেনো কীকরে?? যে কোনটা ভালো ব্যাক্টেরিয়া আর কোনটা খারাপ?"
– "তোদের মত আমাদেরও হেড আছে, সেই আমাদের বলে দেয় ।"
– "বেশ তো।"
– "আজ তবে চলি রে বোন পরে আবার দেখা হবে.."
এই বলে ফাজ চলে গেলো সেখান থেকে। রিয়া আগের মতোই বসে রইলো। কিছুক্ষন পর ফাজ মুখ গোমড়া করে ফিরে এল। তাকে দেখে রিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল ------
– "ফিরে এলে যে ?"
– "জানিস কাদের মারতে হবে; তাদের লিস্ট টা পেয়ে গেলাম আজ"
– "তাই??"
– "সত্যি করে বলতো বোন তুই এখানে কি কাজ করিস?"
দাদার এরকম প্রশ্ন শুনে রিয়া কিছুটা থতমত খেয়ে উত্তর দিল ---
– "টক্সিন রিলিজ করি।"
– "তুই জানিস বোন তোর এই টক্সিনের জন্য মানুষের UTI হয়েছে আর তোকে মারার জন্যই আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে ।"

কথাটা শুনে রিয়া কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে যায়, পরে দাদার দিকে তাকিয়ে বলে – "আমার আর কি, আমিতো একটা ব্যাক্টেরিয়া মাত্র যতক্ষণ ভালো করি ভালো, খারাপ করলেই মৃত্যু। কিন্তু মানুষটা যদি স্বাভাবিক জীবন যাপন করত, তাহলে কি আর আমি এখানে আসতাম? নাকি একাজ করতাম .. কিন্তু তাতেও দোষ আমারই আমাকেই মরতে হবে।"
কথা শুনে ফাজ এর চোখে জল এসে গেল।
রিয়া আবার বললো –
– "ভুল যখন করেছি মরতে তো হবেই, তাই মরার আগে মানুষদের একটাই কথা বলতে চাই তোমরা অনিয়ম কোরো না , স্বাভাবিক জীবন যাপন করো, এতে তোমরাও অসুস্থ হবে না আর আমাদেরও মরতে হবে না।"
এটি বলেই রিয়া অজ্ঞান হয়ে যায় যখন জ্ঞান ফেরে তখন সে দেখে সে জলে ভাসছে। বুঝতে পারে মৃত্যুর আগেই সে ডিসচার্জ (ইউরিন) এর মাধ্যমে মানুষের শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে ।
এটা দেখে রিয়ার যেমন আনন্দও হল তেমন খারাপ ও লাগল, এটা ভেবে, তার জায়গায় আজ অন্য ব্যাক্টেরিয়া মরলো শুধু মানুষের ভুলের জন্য।
তাই মানুষদের বলা... , " অনিয়ম না করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন, সুস্থ থাকুন।"

এক রেডিমেড গল্প

ডা: তাপস ভট্টাচার্য
PRINCIPAL,BMLT-BSSPS

'চন্দ্রমুখী বিক্রম'। সোমবার দুপুর ২টো ৪৩। জি এস এল ভি মার্ক থ্রি-র যাত্রা শুরু শ্রীহরিকোটা থেকে।পাঁচ,চার,তিন,দুই,এক.....। দিগন্তে ছিটকে উঠল বাহুবলী।গুম-গুম শব্দ,ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি দিল সে।

'পরপর গণপিটুনি,এ বার নাগরাকাটায় খুন বহুরূপী'। এ দিন সকালের নাগরাকাটায় শুল্কাপাড়ায় ওই ব্যক্তি বহুরূপী সেজে ভিক্ষে করতে এলে তাঁকে ঘিরে মারতে শুরু করে লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ এলাকায় যায়। কিন্তু মারমুখী উন্মত্ত জনতার হাত থেকে লোকটিকে বের করে আনতে পারেনি তারা। স্থানীয় একটি অংশের দাবি,কার্যত পুলিশের চোখের সামনেই পিটিয়ে, মাথা থেঁতলে খুন করা হয়েছে লোকটিকে।

'ছেলেই চাইছে মোদীর ভারত।' উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলায় ১৩২ টি গ্রামে গত তিনমাসে ২১৬ টি শিশুর জন্ম হয়েছে। যার মধ্যে একটিও মেয়ে নেই।যা থেকে স্পষ্ট,ঢালাও কন্যা-ভ্রূণ হত্যা চলছে।

'দেড় বছর ধরে গণধর্ষণ।' দেড় বছর ধরে ইনদওরে ১৬ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ছ'জনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে বছর পঞ্চাশের এক ঠিকাদার, তার ছেলে ও আরও তিনজন। অভিযুক্তদের একজন নাবালক।

এইসব টুকরো গল্পের একটি লাইনও আমার নয়। এক বহুল প্রচারিত পত্রিকার একদিনের খবরের অংশবিশেষ-এমন এক পত্রিকা যা না পড়লে পিছিয়ে পড়তে হয়।

আপনারা শুধু যেখানে যেখানে ইচ্ছে হবে জোরে জোরে জয় শ্রীরাম অথবা বন্দেমাতরম অথবা ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলবেন। অথবা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণার কথাও বলা যেতে পারে।তাহলে প্রত্যেকেই এক নতুন গল্পের সন্ধান পেয়ে যাবেন।

কৃতজ্ঞতা

চয়ন বিশ্বাস
BMLT, 2ND YEAR

ঘটনাটি হল ভারতের উত্তর প্রান্তের এক ছোট গ্রামের। বছর পাঁচ এর এক ছোট ছেলে তীর্থ সেখানেই এক অনাথালয়ে থাকে। একদম ছোট বয়সে সে তার বাবা মা কে হারায়। তারপর থেকে এই অনাথালয়ই তার পরিবার হয়ে ওঠে।

একবার সেই ছোট গ্রামে হঠাৎ এক রাত্রে জঙ্গি হামলা হয়। হামলা হয় সেই অনাথালয়েও। পুলিশ প্রশাসন এসে সবকিছু আয়ত্তে আনতে আনতে সব শেষ হয়ে যায়। যারা বেঁচে ছিল তাদের সরকার উদ্ধার করলেও, তারা তীর্থকে খুঁজে পায়নি। সে এক স্তম্ভের নীচে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে। তিন দিন পার তার জ্ঞান আসে। জ্ঞান আসার পর চারিদিকে সব দেখে তীর্থ মৃতপ্রায় হয়ে যায়। তিনদিন জ্ঞানহীন থাকায় তীর্থ খিদে আর পিপাসায় তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য৷ পাগলের মতো খাবার খুঁজতে থাকে। খিদের কষ্টে মৃতপ্রায় হয়ে যায়।

হঠাৎ সে দেখতে পায় একটা বছর চল্লিশের মহিলা বাড়ির বেলকনিতে বসে কিছু খাবার খাচ্ছে। তীর্থ তার কাছে অনুরোধ করে। কিন্তু মহিলাটি ভয়ে তাকে বাড়িতে আনতে চায় না, কারণ সে সময় চারিদিকে কার্ফু চলছিল। কিন্তু তীর্থ যখন বলে সে তিন দিন ধরে কিছু খায়নি, মহিলাটি নিজেকে আটকে রাখতে পারে না। বাড়িতে এনে চারটে পাউরুটি এবং এক গ্লাস দুধ এনে দেয়। খাবার পেয়ে ছোট্ট তীর্থ যেন নিজেকে খুঁজে পেল, যেন নতুন করে বেঁচে উঠল। খাবার শেষ করার পর, মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির বাইরের নেমপ্লেট এর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে। তারপর চলে যায়।

এই ভাবেই কেটে যায় তিরিশটা বছর। চল্লিশ বছরের মহিলাটি এখন এক বৃদ্ধা। একদিন রাস্তায় তাকে এক গাড়ি এসে ধাক্কা মারে। গুরুতর অবস্থায় রাস্তার লোকজন তাঁকে হাসপাতলে ভর্তি করে। তিন চার জন অভিজ্ঞ ডাক্তারদের প্রচেষ্টায় বৃদ্ধা প্রাণ ফিরে পায়। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হতে থাকেন। কিন্তু তাঁর মাথাতে একটা জিনিসই ঘুরতে থাকে, যে, সে হাসপাতলের এত টাকা বিল পুরণ করবে কীভাবে। দিন রাত তার মাথাতে এই ভাবনাই চলতে থাকে। তারপর বৃদ্ধা পুরোপরি সুস্থ হয়ে হাসপাতলের বিল দেখতে যায়। নার্স তাকে এক লম্বা বিলের ফরদি এনে দেয়। বিল দেখে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। বিল হয়েছে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা। কিন্তু সেই বিলের নীচে লেখা আছে ' Your Payment is fully Paid.'

আরে এক ছোট কাগজের টুকরোতে লেখা আছে, আজ তাহলে একগ্লাস দুধের দাম দিতে পারলাম। এখন বৃদ্ধার চোখে জল। নার্সকে বলে সেই ব্যাক্তিটার সাথে দেখা করতে চায়। নার্স জানায়, যে আপনার বিলের টাকা দিয়েছে, তিনি এই হাসপাতলের মালিক। নার্স মহিলাকে সেই ব্যাক্তির কাছে নিয়ে যায়। সেই ব্যাক্তি আর কেও নয় সেই ছোট তীর্থ। সে বলে আমি আপনার অবদান কোনদিন ভুলব না, আপনার জন্যই হয়তো আজ আমি এতদুর আসতে পেরেছি। আমি আপনাকে ওই জায়গায় অনেক খুজছি। আমি সেদিন আপনার নেমপেলট দেখে আপনার নামটা মনে রেখেছিলাম। কিন্তু সেখানে আপনাকে খুজে পায়নি।

চির কৃতজ্ঞ, আজও বলছি সেই এক গ্লাস দুধ আর পাউরুটির জন্য...

তীর্থ বৃদ্ধার পা ছোঁয়। স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধার কম্পমান হাত তখন তীর্থের কেশবিন্যাসে স্নেহমমতায় লিপ্ত।

জীবনের অন্তিম দিনগুলি

কৃষ্ণপদ হাজরা
BMLT, INTERN

আজ ব্যাংকে গিয়েছিলাম। ATM এর ব্যাপারে কিছু তথ্য জানতে। সেখানে পৌঁছেছিলাম ঠিক বেলা ১০ টা নাগাদ। দেখলাম বেশ কতজন বয়স্ক মানুষ দাড়িয়ে আছেন টাকা তুলবেন বলে। কিছুক্ষণ কথাবার্তায় জানতে পারলাম, যে তাঁরা মাসের পেনশন তুলতে এসেছেন। দেখতে দেখতে ব্যাংকের দরজাটা খুলে দিল কে একজন। ভিতরে ঢুকে গেলাম সকলে। এতক্ষণ যাঁরা বাইরে দাড়িয়ে ছিলেন তাঁদেরকে যারা চেনেন, দেখলাম, এসে প্রণাম করছেন আর জিজ্ঞেস করছেন - "স্যার ভালো আছেন তো ?" এরপর আর আমার বুঝতে বাকি রইল না, যে এনারা প্রাক্তন শিক্ষক , একসময় এনারাও স্কুল দাপিয়েছেন , ওই হাতে কতজনকে শাস্তি দিয়েছেন, এমনকি ওই হাতেই কত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা বর্তমানে প্রাক্তন । তাঁদের কাছে এই ছাত্রদের কাছ থেকে "স্যার ভালো আছেন তো ?" কথাটা অনেকখানি পাওয়া। সত্যি যখন তাদেরকে এরকম করে জিজ্ঞেস করছিলেন তাঁদের খুব খুশি দেখাচ্ছিল। সেটা দেখেই মন ভরে গেলো। ব্যাস পাওনা তো এইটুকুই ,দেখেও খুব ভালো লাগল।

ফেরার পথে

দীপশিখা মান্না
HUMAN PHYSIOLOGY FACULTY(BMLT-BSSPS

"ওই শোন!!"...
ডাক শুনে ফিরে তাকাতেই দেখে, সেই পুরোনো হাসি...

বহু বছর আগে এই অক্টোবরের কোন এক দিনে বন্ধুত্বের সূচনা। দিনটা যদিও আজও কেউই মনে রাখতে পারেনি, কিন্তু সেই হাসি আজও মনে আছে। একসময় ক্লাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাত্রী ছিল মিষ্টি। Annual Function-এ বাবার সাথে সাইকেল ভর্তি করে পুরস্কার নিয়ে ফিরত বাড়িতে।এমন কোনো event ছিল না যেখানে মিষ্টি পুরস্কার পেত না। স্কুল এর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মজা করে বলতেন " তুই স্টেজ থেকে নামছিস কেনো ওখানেই থাক।" স্কুলের সকলের প্রিয়, সর্বদা প্রথম হওয়া এই মেয়েটি একদিন মিহির স্যারের টিউশন থেকে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ পেছনে কেউ ডাক দিল " ওই শো--ন"
ফিরে দেখে পাড়ার দাদা তপেশ।
" আরে তুমি এদিকে কোথায় যাবে?" জিজ্ঞাসা করে মিষ্টি।

"সামনেই ভাইফোঁটা তাই বোনের জন্যে উপহার কিনতে যাচ্ছি। " জবাব দেয় তপেশ।
বলে, "চল তোকে ছেড়ে আসি বাড়িতে।"
"নানা আমি যেতে পারব, কোনো দরকার নেই" বলেই এগিয়ে যায় মিষ্টি। তপেশদা সাইকেল থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

"কোন ক্লাস তোর?? "
"ক্লাস সেভেন গো। জানো, আমি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি। কাল মেডেল পেয়েছি, এই দেখো।" মিষ্টি এর চোখে মুখে তখন গর্বের হাসি । যতই হোক তপেশদা তো পাড়ার সবচেয়ে brilliant স্টুডেন্ট বলেই পরিচিত। সেই তপেশদার সামনে মেডেল দেখানো কি আর সহজ কথা!

কিন্তু এ কি!!!
তপেশদা মেডেল ছেড়ে হঠাৎ মিষ্টি এর হাত ধরল কেনো?
"তুই মেডেলটা ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। কেমন লাগে আমাকে তোর?" জিজ্ঞাসা করে তপেশ।

ডাকাবুকো, ছটফটে,প্রাণবন্ত মিষ্টি সেদিন 'থ' বনে গিয়েছিল।তপেশ কিন্তু থেমে থাকেনি হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল মিষ্টির দিকে। মিষ্টি তো সবসময় কারোর না কারোর হাত ধরেই ঘুরতে থাকে। সেই সকালে উঠে দাদুর হাত ধরে প্রাতঃভ্রমণে যায় , আবার টিউশন থেকে ফিরেই বাবার হাত ধরে স্কুলে যায়। আর স্কুলে পৌঁছে মুদীপ্তা থেকে সুর্য সকলের সাথেই তো ও রোজ হাত ধরেই খেলে। কিন্তু এমন অনুভূতি ওর কখনো হয়নি। মনে হচ্ছে হাতের তালুতে লক্ষ পোকা কিলবিল করছে।তলপেটে এক অদ্ভুত চাপ অনুভব করছিল। গাটা শিরশির করছিল । কেমন যেনো দলা পাকিয়ে বমি পাচ্ছিল । মিষ্টি এক ঝটকায় হাত সরিয়ে বলে " আমি জানি না তপেশদা, আমায় যেতে দা----ও---"
তপেশদা আরো জোরে হাতটা চেপে কাছে টেনে বলল " আচ্ছা তোর মেডেলটা না হয় আমায় দেখা, কিন্তু চলে যাস না---"
ঠিক সেই সময় একটা ডাকে দুজনেই ফিরে তাকিয়ে দেখে তপেশদার বোন তমসা।

"কিরে দাদা ? আমার gift কোথায়?" জিজ্ঞাসা করে তমসা ।
তপেশ ছুট করে মিষ্টির হাতটা ছেড়ে সাইকেল নিয়ে এগিয়ে বলে "এই যে দেখ, আমাদের পাড়ার সেই ছোট্ট মিষ্টি, কত বড় হয়ে গেছে। স্কুলে 1st prize পেয়েছে। তাই ওকে congratulate করছিলাম।" একটু থেমে আবার -
"সত্যিই ও অনেক বড় হয়ে গেছে" বলেই তমসা জড়িয়ে ধরে মিষ্টিকে। কিন্তু এ কি! মিষ্টি তো থরথর করে কাঁপছে। এ কোন মিষ্টি! সারা শরীরে যেন শীতল শোণিতধারার খরস্রোত বয়ে চলেছে। তমসা অবাক হয়ে দেখে মিষ্টিকে। মিষ্টির চোখে তখন বাঁধ ভেঙেছে। কিছু কথা ভাষা ছাড়াও অন্তরে গিয়ে বিদ্ধ হয়। সেদিন দুটি দৃষ্টি ও একজনের অদ্ভুত উপস্থিতি অনেক কথা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

ওই বছর থেকে আর কোনো gift নিতে পারেনি তমসা, ওর দাদার থেকে।

আজ দশ বছর পর আবার সেই গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে "মিষ্টি---" ডাক শুনে পেছনে তাকায়।
পরিণত মিষ্টি একটু হেসে বলে " ভালো আছো?"

কম্পার্টমেন্ট

তন্ময় দাস

LATERAL ENTRY 2ND YEAR, BMLT-BSSPS

আমার ভাইয়ের সাথে পরিবারের দুরত্বটা আমার চোখের সামনেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল ওর উশৃংখল জীবন-জাপনের আর অনিয়মের কারনে , ওর কাছে ওর বন্ধু-বান্ধব বা অফিস কলিগরাই সব, বাড়ির নিজের স্ত্রী প্রতিও দায়বদ্ধতা প্রায় নেই বললেই চলে,প্রায়দিন দেরী করে বাড়ি ফেরে আর স্ত্রীর সাথে এই কারণে ঘনঘন অশান্তি.... কয়েকবার তো ওর স্ত্রী কিছুদিনের জন্য তার বাবার বাড়িও চলে গিয়েছিল,তাতেও ভাইয়ের কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না।আমার চোখের সামনে আমি ওদের সংসারটা এভাবে ভাঙতে দিতে পারতাম না,কিন্তু কোনো উপায়ও বের করতে পারছিলাম না। আসলে বলে না সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎসঙ্গে নরকে ঠিক সেটাই হচ্ছিল,ওর বন্ধু বান্ধবদের গ্রুপটা আমার ঠিক পছন্দ নয়,আর ঠিক সেই জন্যই বলতে হয় আমি যতটা শান্ত,একটা নিয়মশৃংখলার মধ্যে দিয়ে চলি ও তার ১৮০ ডিগ্রি উল্টো।এই নিয়ে বাড়িতে প্রায়ই একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়, জিনিসটা এইভাবে বাড়তে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না ভেবে আমি আমার দাদুর সাথে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম,দাদু পুরো ব্যাপারটা শুনে একটু চিন্তা ভাবনা করে আমায় বলল যে -তুই অভিকে নিয়ে আয় এসে ঘুরে যা,অনেকদিনই তো হোলো তোদের দুই ভাইয়ের কোনো পাত্তা নেই। আমি প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারলাম যে দাদু ওকে বোঝানোর জন্য ডাকছে। ব্যাপারটা আদেও কোনো কাজে দেবে বলে আমার আশা ছিল না তাও চেষ্টা করতে অসুবিধা কোথায় সেই ভেবে দুই ভাই মহালয়ার দিন ভোরবেলা পাড়ি দিলাম মামার বাড়ির উদ্দেশ্যে। যথাসময়ে পৌঁছে গিয়ে দুপুর গড়িয়ে রাত হল,রাতের খাওয়া দাওয়ার পর দাদু আমায় অভিকে নিয়ে ছাদে যেতে বলল,আমি-অভি ছোটবেলায় প্রায়ই খাওয়া-দাওয়ার পর ছাদে উঠে গল্প-গুজব করতাম,চলতি সময় আর বাড়তি দায়িত্বের ঘেরাটোপে সে সব কোথায় হারিয়ে গেছে। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি দাদুর পায়ের আওয়াজ, তাকিয়ে দেখি দাদু এসে আমাদের কে হাত নেড়ে ডাকছে আর বলছে তাড়াতাড়ি দেখবি আয় একটা জিনিস,আমি আর অভি ছোটো বেলার মত উৎসাহের সাথে গেলাম দাদু কি দেখাবে সেটা দেখার জন্য। ছাদ থেকে দুরে ট্রেন লাইনে দুরপাল্লার ট্রেন যাওয়া দেখা যায়,ছোটোবেলা থেকেই দাদু ওই ট্রেনই আমাদের কে দেখাত আর বলত "এটাই আমাদের জীবন" আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ত। আমরা দুজন তখন একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করতাম আর বলতাম যে দাদু ছাদে এনে আমাদেরকে শুধু এই ট্রেন যাওয়া দেখায় দাদুর কি আর অন্যকিছু নেই দেখাবার মত। সেইদিন রাতেও তার ব্যতিক্রম হল না... অভি আমার খোঁচা মেরে সবে কিছু একটা বলতে যাবে ততক্ষনে দাদু ট্রেনটা দেখানোর পর "এটাই আমাদের জীবন" এই উক্তির যে ব্যাখ্যা দিল তা শোনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। ছোটবেলা থেকে শোনা ওই কথাটার অন্তর্নিহিত মানে যে এতটাই বিস্তর সেটা বোঝার বয়স বোধহয় তখন ছিল না, তাই হয়ত দাদু সেটা তখন বলা টা প্রয়োজনীয় মনে করেনি। দাদু যে ভাবে কথাগুলো শুরু করেছিল সেটা এইরকম-

দাদুভাই ওই যে ট্রেনগাড়ি টা গেল ওটাই আমাদের জীবন.... অভি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল কারন সেই একই কথা কিন্তু তারপর মুচকি হাসি থেমে গেল কারন দাদুর কথা শেষ হয়নি তখনও, দাদু বলতে থাকল....

ধরো ওই জীবনরুপ ট্রেন গাড়িতে আমরা সবাই আছি, তাহলে আমরা সবাই একে অপরের সহযাত্রী,যারা বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে উঠেছি। আমরা আমাদের নিজের পরিবারের সাথে ট্রেনটির ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠেছি,আমাদের আর সমস্ত আত্মীয়রা উঠেছে সেকেন্ড ক্লাসে,বন্ধু বান্ধবীরা থার্ড ক্লাসে। এখান থেকেই আমরা আমাদের জীবনে কার গুরুত্ব কতটা তার একটা অনুমান পেয়ে যাব বুঝলে দাদুভাই,তাহলে আর কোনো দ্বন্দ থাকে বির্তকে থাকবে না যে তুমি তোমার জীবনে কাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছো।তারপর দাদু ওকে বলতে থাকে আর আমি মন দিয়ে শুনতে থাকি দাদুর ব্যাখাটা-

১)বন্ধুরা যারা থার্ড ক্লাসে আছে তাদেরকে সেই জেনারেলকামড়ায় রাখার কারণ এই জেনারেল কামরায় যেমন সব প্যাসেঞ্জারে উঠতে পারে ঠিক তেমন আমাদের মনরুপ কম্পার্টমেন্টে অনেকে বন্ধু আসতে পারে তারা যে কখন কোন প্লাটফর্ম

(প্ল্যাটফর্ম =জীবনের একটা পর্যায়)থেকে উঠছে কখন কোন প্লাটফর্মে নেমে যাচ্ছে তার খোঁজ আমরা রাখি না। ঠিক তেমনই আমাদের জীবনে তাদের গুরুত্বটাও সেই নাম না জানা প্ল্যাটফর্ম এর মত, অর্থাৎ অতটা নেই কারণ তারা কোনোদিন যাত্রার শেষ পর্যন্ত আমাদের পাশে থাকতে পারবে না,কারণ তারা তাদের নিজের যাত্রা পথের পথিক, তাদের যাত্রা পথের সাথে তোমার যাত্রা পথের সামঞ্জস্য থাকতে পারে না।

তাদের সাথে তোমার যাত্রাপথ কয়েকটা প্লাটফর্মে যাত্রা মাত্র (জীনের কয়েকটা পর্যায় পর্যন্ত)।

২)এবার আসি সেকেন্ড ক্লাসে থাকা আমাদের আত্মীয়দের কথায়- যেমন আমি তোমার দিদা মামা মামি মাসি সবাই... তাদের সিট কম্পার্টমেন্টে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আগে থেকেই বুকিং করা থাকে। যেমন তাদের সিট আমরা বদল করতে পারি না তেমন তারাও আমাদের কামরায় আসতে পারে না এবং তাদের প্রত্যেকের যাত্রাকাল একই রকম একটা নির্দিষ্ট প্লাটফর্ম পর্যন্তই। অর্থাৎ তোমার আত্মীয়রাও হয়তো তোমার মতন একই যাত্রা পথের সহযাত্রী কিন্তু তোমার জীবনের সুখ দুঃখ ওঠা নামা সবকিছু সহযাত্রী নাও হতে পারে বা সে বিষয়ে আশা না করাই ভালো কারণ তাদের থেকে আমাদের দুরত্ব বা বিভেদ ওই কম্পার্টমেন্টের বেরিয়ার এর মত। ইচ্ছা হয়তো হয় এই কম্পার্টমেন্টে (ফার্স্ট ক্লাস) আমার কিন্তু নিজের পরিবার ছেড়ে আসতে পারেনা কোনোদিনও।

৩) এবার আসি ফার্স্টক্লাসের কথায় যেখানে তোমার খুব কাছের লোকজন যেমন বাবা-মা ভাই-বোন দাদা দিদি স্ত্রী আছে। ট্রেন যত এগোয় সময় তত বাড়ে, আর এই সময়ের খেলা বড়ই অদ্ভুত যারা একদিন একসাথে খাওয়া-দাওয়া ঘোরা-ফেরা বা যাবতীয় কাজকর্ম করত তারা একদিন না একদিন ঠিক তাদের নিজস্ব জীবনের প্ল্যাটফর্মে তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে নামবেই। তাদের রাস্তা তাদের চিন্তাভাবনা সবকিছু যে তোমার দেখানো রাস্তার মতনই হবে তা কিন্তু একদমই নয় আর সেটা আশাও কোরো না।

ভাই বোন দাদা দিদি সন্তানেরা সবাই কিছু অপরিচিত লোককে নিজের জীবনে নিজের পরিচিতি দিয়ে তাদেরকে আপন বানাবে তখন ইচ্ছাকৃতভাবে না হলেও সময়ের এই অদ্ভুত খেলায় তাদের কাছে তোমার কদর কমবেই কারন তুমিও কিন্তু তাদের সাথে তাদের প্লাটফর্মে নামবে না,কারন তোমার গন্তব্য অন্য কোথাও । তারপর দেখবে ট্রেন যত শেষ প্লাটফর্মের দিকে এগোবে একে একে তোমার সব কাছের মানুষ গুলো নেমে গেছে যে যার গন্তব্যে। শেষ প্ল্যাটফর্ম এর আগের প্লাটফর্ম আসতে দেখবে বাবা-মাকে কিংবা মা বাবাকে বলবে "চলো সারা জীবন সংসার,পরিবার-পরিজনদের সময় আর কর্তব্য পালন করতে করতে নিজেদেরকে সেই পুরানো দিনের মতন চিনতে ভুলে গেছি এবার এই দায়িত্ব ও কর্তব্য ছেলে আর বৌমার কাঁধে দিয়ে আমরা বিশ্রাম নেই আর এত চাপ ভালো লাগে না"। এই বলে সেই শেষ প্ল্যাটফর্মের আগের প্লাটফর্ম টায় তারানেমে যাবে তাদের বাকিটা জীবন নিশ্চিন্তে কাটানোর উদ্দেশ্যে। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে তুমি দেখবে কম্পার্টমেন্টের কোলাহল কোথায় যেন নিমেষের মধ্যে হৃদয়বিদারক নিবিড় এক নিস্তব্ধতায় ঢেকে যাবে....এমনই সময় শেষ প্লাটফর্মে এসে পৌঁছেছে তোমার জীবনরুপ ট্রেন,এবার তোমার নামার পালা!দুরে চড়াই উতরায় কাঁটা বিছানো পথ দেখা যাচ্ছে উপায় নেই সেই পথ ধরেই যেতে হবে তোমাকে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তির দিকে,দেখবে নিজেকে তখন শূন্য মনে হবে,মনে হবে এইসব কোলাহল পূর্ণ জীবন আসলে তবে কি সব মায়া? এই সব ভাবতে ভাবতে তুমি ভেঙে পড়বে ভিতর থেকে -এমনই সময় পিছন থেকে একটা "নরম সবল "হাত এসে তোমার হাতটা ধরে বলবে- কই চলো নামবে তো? সেই দেখছি কখন থেকে তুমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছো আর কত ভাববে? এবার দেরী হয়ে যাচ্ছে যে অনেক কাজ বাকি....।তুমি না চাইতেই এমনই একজন যাকে তুমি তোমার পুরো যাত্রাপথে একেবারেও মনেই আনোনি.. সেই একমাত্র সত্তা যে তোমার হাত ধরার জন্যই তোমার চলার পথে পথিক হওয়ার জন্যই তাকিয়ে বসে থাকবে তোমার যাত্রাপথের শেষ প্লাটফর্মের জন্য এবং শেষ গন্তব্য পর্যন্ত তোমার সাথী হয়ে সমস্ত চড়াই উতরাই পার করবে একই সাথে শক্ত করে তোমার হাতটা ধরে তালে তাল মিলিয়ে..... আর সেটা আর কেউ নয় দাদুভাই তোমার " স্ত্রী"। কাজেই স্ত্রীকে আর যাইহোক কোনোদিন অপমান বা কষ্ট দিও না, নাহলে শেষ সময়ে ভরসার সেই হাতটা তুমি হারাবে।।।।।।।।।

সব কথা শেষে আমি অভির চোখের দিকে তাকালাম.. নেহাত ছেলে তাই নিজের ভুলটা উপলব্ধি করে চোখের জলটাকে মিথ্যা হাসির শব্দে লুকিয়ে ফেলে দাদুকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ ওই ভাবেই থাকল.....

ট্রেনের চাকা(পাহিয়া)= সময়,
প্ল্যাটফর্ম = জীবনের পর্যায়(শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য)
ট্রেনগাড়ি = জীবন
কম্পার্টমেন্ট/বগি= মানুষজনের অবস্থান
ট্রেন রাস্তা = মানুষের জীবনকাল।

প্রথম অনুভূতি: কচিপাতা

দেবজ্যোতি দাস
BMLT, 3RD YEAR

মনে পড়ে আমাকে? এখন আর তেমনভাবে মনে পড়ে না। ---তাই না? ভুলে গেছো কি?
আগে তো সবসময়ই প্রয়োজনে ছিলাম আমি। প্রথম স্পর্শের হাত ধরেই তুমি একটু একটু করে বেড়ে উঠেছিলে। তোমার আত্মপ্রকাশের সময় থেকে তোমার মাথার ওপর ছাতা হয়ে ছিলাম। প্রখর সূর্যতাপ স্নাত হয়ে তোমাকে ছায়া দিয়েছি প্রতি মুহূর্তে। শিকড় বেয়েই জল নিয়ে এসে রান্না করে রেখে দিয়েছি ফ্লোয়েমের কাছে তোমার প্রতিদিনের ক্ষুধা মেটানোর জন্য। সবুজ ক্লোরোফিল গায়ে মেখে সর্বদাই তোমাকে সতেজ রেখেছি। মূলোরোমের কাছ থেকে জাইলেমের মধ্যে দিয়ে জল এনেছি তোমার তেষ্টা মেটানোর জন্যই। প্রচন্ড তাপপ্রবাহে বাষ্পমোচনের জল দিয়ে তোমাকে ভিজিয়ে ছিলাম। প্রচন্ড ঝড়েও বৃন্তটুকুও ছেড়ে দেয়নি তোমাকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই। লক্ষ্য রেখেছিলাম বৃষ্টির ফোঁটাটি যেন তোমার কোমল হৃদয়ে ক্ষত না তৈরি করে।
একটু একটু করে যখন বয়স বাড়তে শুরু করলো, রংটাও যে কখন হালকা সবুজ থেকে পাকা হলুদ হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না আমি। তোমার প্রতিদিনের খেয়াল-দায়িত্বের মধ্যেই সময় পেরিয়ে গেল।
আজ অনেক পাতাকে স্থান দিয়েছি আমার ওপরে। রংটাও আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। রোদে পুড়ে বাদামি হয়ে গেলাম। দেহের প্রতিটা অংশ ফুঁকড়ে শুকিয়ে কড়ে-কড়ে হয়ে গেছে। বৃন্তটুকু দিয়ে তোমার ওই রুক্ষ স্পর্শ আর ধরে রাখতে পারছি না। অনেক পুরু তোমার বাকলের স্তর। শিকড় থেকে জলটুকু বয়ে আনতে পারিনা আর। দেহের প্রগৌণ কোষপ্রাচীর গুলো আজ আর জল টানতে পারে না।
তোমার কাছে তোমার স্পর্শের সাথে আজ বোঝা হয়ে গেলাম। আমার নগণ্য ভার টুকু তোমার কাছে অসহ্য মনে হয়। আর ভেবো না তুমি। যখন তুমি অচেনা জগতে নতুন ছিলে তখন তোমাকে সুরক্ষিত রাখাই আমার কাজ ছিল। আমার জীবনে সৌভাগ্যটুকু হল সৃষ্টিবীজের নির্দেশেই সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়েই তোমাকে রক্ষা করা। আজ তুমি অনেক পরিণত।
চারিদিকের আবহাওয়ার সাথে আর মেলাতে পারছিনা নিজেকে। কখনো প্রচন্ড তাপ আবার কখনো ঝোড়ো হাওয়ার দাপট, কখনো বা আবার বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে খুব জোরে কেঁপে উঠি আজকাল। সইতে পারি না কোনো আঘাত।
না, কিছুতেই পারছি না আজ, দুর্বল হয়ে গেছি অনেক। মধ্যাকর্ষণ টানও যেন বেশি হয়ে যাচ্ছে। হয়তো আর কিছুক্ষণেই ঝরে পড়বো তোমার পদস্থলে। সময়ের সাথে পচন ঘটবে আমার, সর্বাঙ্গে আক্রমণ করবে ব্যাকটেরিয়ার দল বা ছত্রাকের অনুসূত্র। কালের নিয়মেই মিশে যাবো আমি মাটিতে, থাকবে না আর কোনো প্রাণ। দেহের শেষ অংশটুকু বিয়োজিত হয়ে অতিসরলতম মৌলে পরিণত হবে, সার হয়েই তোমার পুষ্টির যোগান দেবো। স্পর্শ থেকে হারিয়ে গেলে আর ফেরা সম্ভব হবে না কোনোদিন। সময়ের সাথেই এই ক্ষতটুকু হয়তো তুমি অনায়াসে সারিয়ে ফেলবে। অনেক হরিৎ-সমারহেই তুমি দিন কাটাবে। শুধু হারিয়েই যাবো আমি।
জানি ভুলে যাবে আমাকে, স্মৃতিটুকুও থাকবে না তোমার কাছে। লেখা হবে না কোন গল্প, থাকবো না আমি কোন কবিতার ছন্দে বা অনুগল্পের ভিড়েও আমার ঠাঁই হবে না। অস্তিত্বের হদিশ পাবে না আর কেউ কখনোও । আমার জীবনের সম্পূর্ণটাই না হয় শুধু তোমাকেই দিলাম। তবুও ভুলে যেও আমাকে, হারিয়ে যাওয়ার পর.....

মুড সুইং

ড:শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী

অনেকক্ষণ চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হাঁপিয়ে পড়েছিল তৃষা। তাও, ধীর পায়ে চলতে চলতে বেশ কিছুটা ওপরে উঠে এসেছে। সামনের বাঁকটা ঘুরেই এক অদ্ভুত মায়াবী পৃথিবীলোকের সম্মুখীন হল। মেঘের পরে মেঘ জমেছে পাহাড়ের কোল বেয়ে, স্বর্গলোকের হাতছানি আজ দিচ্ছে অলীক সুখে। মনটা যেন প্রশান্তিতে ভরে উঠল। রুকস্যাকটা নামিয়ে, পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বুক ভরে শ্বাস নিল। চোখ দুটি আপনা হতেই বুজে গেল।

চোখ বুজতেই ভেসে উঠল মর্তলোকের কথা। নাঃ! এজন্যেই, তৃষা আজকাল চোখের পাতা এক করতে চায় না। খুউব কষ্ট, ভয়, আতঙ্ক, যন্ত্রণা হয় ওর। যবে থেকে নারীত্বের গুণ প্রকাশিত হয়েছে, শুরু হয়েছে এই বেদনা। নারী - পুরুষ উভয়েই কেন যে বোঝে না! যন্ত্রণাটা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অদ্ভুত এক মনঃপীড়া। প্রথম যখন মাসিক শুরু হয়, তখন ছিল ভয়, লজ্জা, আতঙ্ক। লোক জানাজানি হলে কী হবে। সকলে বলবে, 'এ বাবা, এত তাড়াতাড়ি, ওই জন্যেই বেশ পেকেছে মেয়েটা। একদম কথা শোনে না।' যেন কী মহাপাপ করে ফেলেছে সে। তৃষা বুঝতেও পারে না , তার দোষটা কোথায়। ঠাকুর ঘরে পা রাখতে পারে না ওই কটাদিন। অনেকবার জানতে চেয়েও ঠিকঠাক উত্তর পায়নি সে, মা ঠাকুমার কাছ থেকে। কারুর কথা প্রসঙ্গে নিজের অভিমত দিতে চাইলেও, শুনতে হত, ' আর বকিস নি, ধিঙ্গি মেয়ে হয়ে গেছিস, ড্যাডাং ড্যাডাং লাফিয়ে বেড়াস নি, যা ঘরে যা, একটু লজ্জাসরম কর।'

আর একটু যখন বড় হল, তখন অন্য এক আতঙ্ক ও যন্ত্রণা। তলপেটের মধ্যে যেন পঞ্চাশটি পাঁঠা বলির তীক্ষ্ণ কষ্ট এসে বাসা বেঁধেছে। তার ওপর আবার রক্তবন্যা। কখন সে, ন্যাপকিনের বাঁধ ভেঙে পরিধানকে রাঙিয়ে তোলে, বুঝে উঠতে উঠতেই তা চক্ষুলজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এইসময় আবার হরমোন নামক একটি তরল ক্ষরণে, শরীর থেকে এক অন্যরকম গন্ধ নিঃসৃত হয়। কারুর পাশে বসতেই লজ্জা করে। একসাথে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে টিউশান পড়াটা, তখন যেন চরম দুর্বিসহ ব্যাপার। সবমিলিয়ে ভীষণ খিটিবিটি লাগে তৃষার। তখন থেকেই ওর মনে হত, এমন কোন একটা জায়গা, যেখানে মনের আরামের সাথে আত্মাও শান্তি পাবে, যেখানে চোখ বুজলে সবুজ পৃথিবীর আদরমাখা স্পর্শ পাবে, যেখানে ভোর হলে পাখির কলতান অ্যালার্মের সংকেতে ডেকে উঠবে, আবার যেখানে মেঘ পিয়ন চিঠি দিয়ে যাবে। যে চিঠিতে লেখা থাকবে রোদ আর বৃষ্টির খেলার কথা, সবুজ পাহাড়কে রুপার মোড়ক দেওয়ার কথা, যেখানে থাকবে গানের সুর, পাতা ঝরার তাল আর বয়ে যাওয়া খরস্রোতার লয়। কিংবা থাকবে, তরঙ্গে তরঙ্গে মেতে ওঠা সাগরের মুক্তকণার গল্পকথা।

নাঃ! সে সুখ তখন জোটে নি, তৃষার। পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে শুরু হল বিয়ে বিয়ে খেলা। হ্যাঁ, খেলাই বটে। একটা করে ম্যাচ হয়, মানে পরিবার আসে, আর কাবাডি, কাবাডি, কাবাডি, কাবাডি। গন্ডেপিন্ডে খেয়েদেয়ে, শতাধিক প্রশ্নে জেরবার করে টাটা বাই বাই। তৃষা তখন হেরে যাওয়া দলের শেষ প্লেয়ারের মত বোবার রোল প্লে করে যায়। মাঝে মাঝে অতীব সচেতন ছেলের মা প্রশ্ন করেন, ' কোন মিস্ট বা টিউমার আছে? বাচ্চাকাচ্চা হওয়ার সমস্যা হবে তাহলে।'

অদ্ভুত লাগে তৃষার, বিয়েই হল না, তো বাচ্চা! বিয়েটা কি বাচ্চা প্রদানের রেজিস্টার্ড কারখানা নাকি? কেউ তো ওর কথা জানতে চায় না, ওর ভালো লাগা, খারাপ লাগা, চাওয়া পাওয়া - সবই যেন নিষ্প্রয়োজন। নাঃ! মা , বাবা, দাদা, ভাই কেউই বোঝে না। মা যাও বা আগে একটু বুঝতেন, দিনে দিনে কেমন যেন সবকিছুই বদলে যাচ্ছে। তৃষারও আজকাল রাগটা খুব বেড়ে গেছে। বিশেষ করে মাসিকের হপ্তা খানেক আগে থেকে রাগটা যেন তুঙ্গে থাকে। বিরক্ত লাগে সবকিছুতেই। সবেতেই যেন মুড অফ। নিজেও ভালো করে বোঝে না কী হলে ভালো হয়। কখনো কখনো খুব কান্না পায়, আবার কখনও এতবেশী বকবক করে, যে নিজেই পরে নিজের কথায় লজ্জা পেয়ে যায়। মাথাটা এক অদ্ভুত যন্ত্রনায় চেপে ধরে। মাঝে মাঝে সর্দিকাশিও, আবার কোমর-পাটাতেও টান ধরে।কখনো কখনো ভীষণ মাথা ঘুরে যায়। আবার কখনও বা কারুর থেকে খুব আদর যত্ন ভালবাসা পেতে ইচ্ছে করে। কখনো কখনো কবিতা বেরিয়ে আসে, নিজের মনেই একা একা কথা বলে যায়। এক এক সময় তৃষার মনে হয় ও বোধহয় পাগল হয়ে গেছে।

এভাবেই ছেলেবেলা থেকে, কিশোর জীবন পার করে কখন যে তারুণ্যের ঘেরাটোপ পেরিয়ে যৌবনে পা রেখেছে, নিজেও টের পায় নি। শুধু বয়সের পরিমাপ আর কর্মক্ষেত্রের চলাচল জানান দিয়ে গেছে - দেখো আমি বাড়ছি মাম্মি। তৃষা এখন কলেজের ফিলোজফির অধ্যাপিকা। নাঃ! বিয়ে সে করেনি। ইচ্ছেও করে না। বিয়ের চাপেই চাকরীটা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল সে।

এতদিন পর পঁয়তাল্লিশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, তৃষা বুঝতে পারে, বিগত দিনের মনের ওলটপালট আর কিছুই নয়, শরীর মধ্যস্থ হরমোনের জৈবিক খেলা। যাকে বাহ্যিক ভাষায় বলে "মুড সুইঙ্গ"। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শরীরেই হয়ে থাকে। তবে নারীদের মধ্যে এর প্রাধান্য বেশী। সকলে মিলে যদি পরিবারের প্রতি একটু বেশী সময় দিতে, একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠতে, লোকে কী বলবে, না ভেবে, কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় ভাবতে, তাহলে বহির্জগতে শান্তির-স্থান সন্ধানের প্রয়োজন পড়ত না। নিজ গৃহই হয়ে উঠত সুখের স্বর্গলোক। আজকালও "মুড সুইঙ্গ" হয়, কিন্তু অতটা পাত্তা দেয় না তৃষা। বেড়িয়ে পড়ে পাহাড়ে, সাগরে বা জঙ্গলে। কখনো কখনো নিজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, কখনও বা একা একা।

চোখ খুলে তাকালো তৃষা। ঠোঁটের কোণে আলত হাসি। একটি সারমেয় ওর পা চাটছে। মাথায় হাত বোলাতেই লেজটা দুলে উঠল। একটু জল খেয়ে পিঠে রুকস্যাকটা তুলে নিল। প্রাণের শান্তিতে, মনের টানে, প্রকৃতির আদরমাখা স্পর্শে, মেঘ পিয়নের চিঠি হাতে তৃষা আবার চলতে শুরু করল। আফটারঅল , এভরিথিং ইজ সুইঙ্গিং।

সোনাঝুরি

আসাদ
BMLT,2ND YEAR

কেটে গেছে বহুকাল নয়, নয় করে নয়টি বছর- শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির হাট।
ব্যস্ত ছিলে তুমি, হাতে গড়া পুতুল বিক্রিতে। আর পাঁচজন ক্রেতার মত আমিও ছিলাম
খদ্দেরের ভিড়ে। তোমার স্নিগ্ধ 'পুতুল নেবেগো----' আজও
বুকের ভিতর শান্তিনিকেতনী তরঙ্গে দোদুল্যমান।
কালো হরিনীর চোখের চাউনিতে সেদিন
আটকে গেছিলেম আমি,
প্রেমে পড়লাম রাবীন্দ্রিক আল্পনায়। বন্ধুরা বলল, "ওরে ও আদিবাসী সাঁওতা----
ল।"

আমার মন তখন গেয়ে চলেছে "নিঃস্ব বিশ্বভূমি, আর তুমি হয়ো নাকো ক্ষুন্ন, এ-মাটি
সবার 'মা'--"তোমার ছোঁয়ায় ঘুচে যাক জাতপাত।

ভাবনার গভীরতায় সম্বিত ফেরে, পুতুল বিক্রি তো শেষ। এবার পসরা গোটানোর
পালা। প্রেম নিবেদন, নাঃ আর বলা হল না।বন্ধুদের তাড়নায় ফিরে এলাম ঘরে। শুধু
---- ঘুম নিলে তুমি কেড়ে।
প্রেম পত্র লিখতে বসেই খেয়াল হল, আরে, নাম তো হয়নি জানা, কী নাম তোমার?

হাট তো ছিল সোনাঝুরি, আচ্ছা কেমন হয়, যদি
তোমায় ডাকি *'সোনাঝুরি'*!
খুব রাগ কি করবে তুমি? কি জানি,হয়ত...

নয় পাতার প্রেম পত্র, তোমায় দিলেম কই, ফেরার পথে ভাসিয়ে দিলাম খোয়াই নদীর
জলে।
নয় নয় করে নয়টি বছর পরে
আবা---র এলাম সোনাঝুরির ঘরে। পেলাম না তো তোমার দেখা। কোথায় তুমি,
আমার আদরমাখা *সোনাঝুরি*???

ফিরে গিয়ে আবার ধরব কলম। করব শুরু তোমায় নিয়ে লেখা। আমার রাবীন্দ্রিক
ভালোবাসা।

এবারের পুজোয় আমাদের তথা B.Sc MLT ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পদক্ষেপ। পুরোনো বস্ত্র দান। নৈহাটি ভইন এর পরিচালনায় এই বস্ত্র সুন্দরবনের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

"Happiness doesn't result from what we get, but from what we give"...

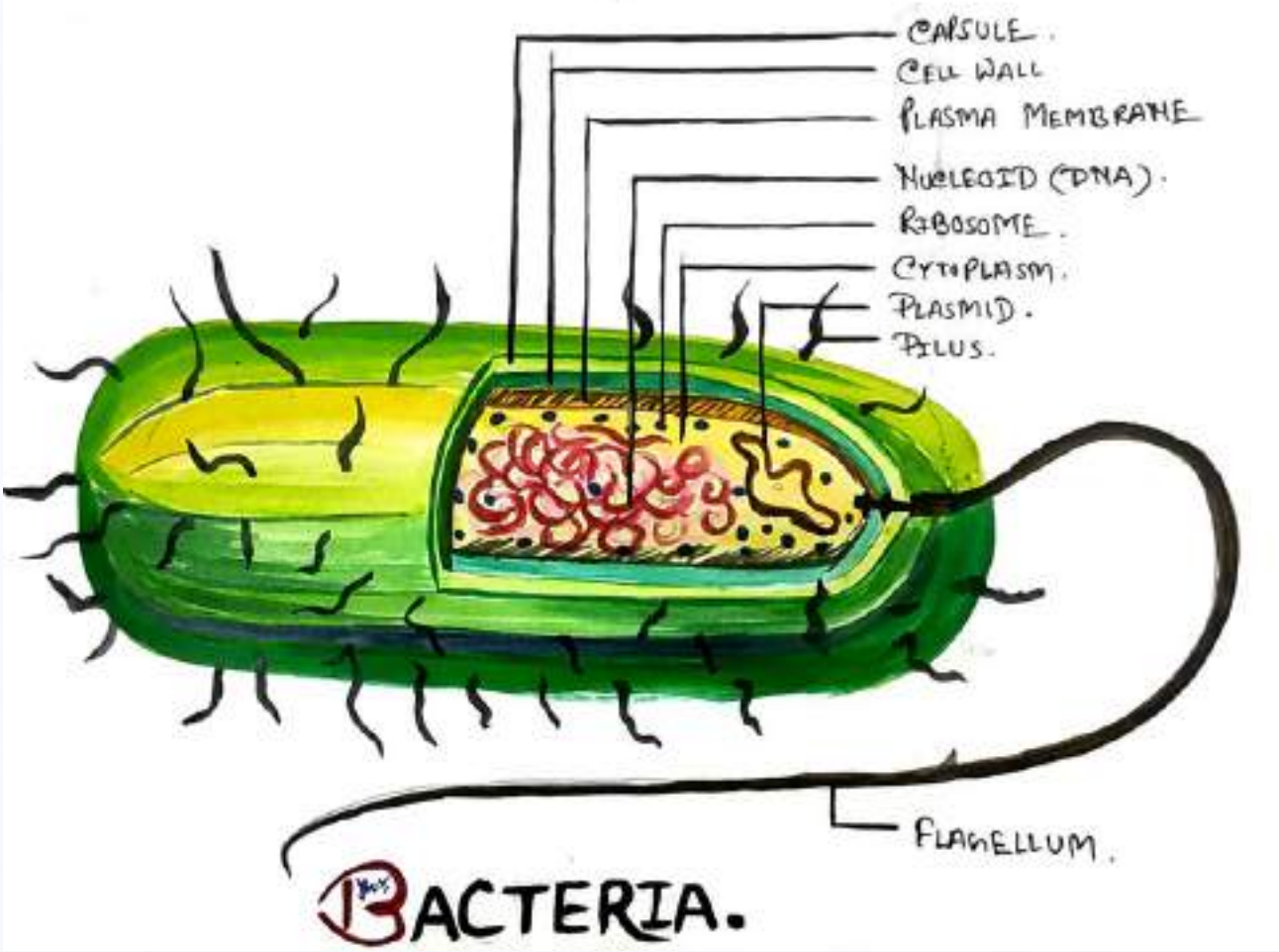

অরিজিৎ দাস

BMLT,2NDYEAR

সমাপ্ত